১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ৪

মুজাফরাবাদ গণহত্যা

চৌধুরী শহীদ কাদের

মুজাফরাবাদ গণহত্যা

চৌধুরী শহীদ কাদের

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর
bis.org.bd

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক : মুনতাসীর মামুন
সহযোগী সম্পাদক : মামুন সিদ্দিকী

প্র কা শ কা ল
পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪
©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
itihassammilani.bd@gmail.com
01816288674, 01715457382, 01711217111

প্র কা শ ক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড
ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০

মু দ্র ক

প্র চ্ছ দ

মূ ল্য

ISBN:

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষকে হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করাও এর অংশ। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন একটি দেশে এত অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি যা হয়েছে বাংলাদেশে। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যা-নির্যাতনের কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতা-বিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর যার পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও করা সম্ভব হয়নি। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনি কী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর উদ্যেগে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাষ্ট'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত প্রায় সহস্রাধিক গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য থাকলেও পুরো কাজটি গবেষণাধর্মী ও অনুসন্ধানমূলক।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমির স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, সবার সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– অন্তরে অনুভব করে তবেই এই ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে সেই ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সংশ্লিষ্ট গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকা 'মুজাফরাবাদ গণহত্যা'য় চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার মুজাফরাবাদ গ্রামে গণহত্যা-নির্যাতনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন চৌধুরী শহীদ কাদের। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি এ কাজে মুজাফরাবাদ গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূ মি কা

মাহবুব উল আলম *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে লিখেছিলেন, যদি গণহত্যা কাকে বলে দেখতে চান, তবে মুজাফরাবাদ গ্রামে এসে দেখে যান। সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক নাসিরউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন, আমি মাইলাই দেখিনি, তবে মুজাফরাবাদ দেখেছি। স্বাধীনতার জন্য জীবনদান যদি সর্বোচ্চ মূল্য হয় তবে মুজাফরাবাদ গ্রামের মত এত বেশি মূল্য খুব কম গ্রামকে দিতে হয়েছে।

পটিয়া উপজেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে আরাকান সড়ক সংলগ্ন মুজাফরাবাদ গ্রাম। গ্রামটি অনেকটা ছবির মত। শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে এই গ্রামের সাথে তুলনা করা যায় এমন গ্রাম চট্টগ্রাম শুধু নয়, সারা দেশে বিরল। সম্ভবত একাত্তর পরবর্তী পরিস্থিতি তাদের স্বাবলম্বী হওয়া ও প্রতিকূলতাকে জয় করতে শিখিয়েছে। ১৯৭১ সালের ৩ মে মুজাফরাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন। আবার হয়তোবা গর্ব কিংবা শপথের দিন। এদিন পাক বর্বর বাহিনী ৮ ঘন্টার পৈশাচিকতায় কেড়ে নিয়েছে প্রায় ৩০০ গ্রামবাসীর জীবন, জ্বালিয়ে দিয়েছে পুরো গ্রাম। প্রায় ২০০ নারীকে করেছে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত। সেদিন সমান তালে হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতনে অংশ নিয়েছিল রাজাকার বাহিনী। মুজাফরাবাদ গণহত্যার প্রায় ৪৩ বছর পর আমি গ্রামটিতে যাই। গ্রামটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই ৪৩ বছর আগে এখানে কী ঘটেছিল। পাকবাহিনী ও রাজাকারদের দ্বারা বিধ্বস্ত গ্রামটি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। স্বজন হারানোর শোককে তারা শক্তিতে রূপান্তর করেছে। হয়তোবা তাই গ্রামের শিক্ষার হার প্রায় একশত ভাগ। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, ব্যাংকার, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ কী নেই এই গ্রামটিতে? শুনে একটু অবাকই হলাম সর্বশেষ ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় এই গ্রাম থেকে ৬ জন উত্তীর্ণ হয়ে ক্যাডার সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী ও স্বজনহারাদের সাথে যখন কথা বলছিলাম, শুনছিলাম ৩ মের বীভৎসতার বর্ণনা, নিজেকে তখন সংবরণ করা বেশ কঠিনই হয়েছিল। পাকবাহিনীর পৈশাচিকতার পাশাপাশি স্থানীয় রাজাকার এবং মুসলিম লীগের পান্ডারা যেভাবে হত্যালীলা, লুটতরাজ ও নারী নির্যাতনে মেতে উঠেছিল, তা মানবেতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায়ের জন্ম দেয়।

আমার জন্ম দক্ষিণ চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর পাড়ে, মুজাফরাবাদের সন্নিকটে। তাই অনেকটা দায়বদ্ধতা থেকে আমার এই কাজের শুরু, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি নিজেই জানতাম না এই গ্রামে কী ঘটেছিল। তাই আগামী প্রজন্মের কাছে মুজাফরাবাদ গণহত্যার বিবরণ, ঘাতকদের পরিচয় ও নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরার নিরিখেই আমার এই প্রয়াস। খুলনায় স্থাপিত *১৯৭১: গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর* যখন গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘন্ট গ্রন্থমালা রচনার উদ্যোগ নেয় আমি আমার প্রথম নির্ঘন্ট হিসাবে মুজাফরাবাদ গণহত্যাকে বেছে নিই। মুজাফরাবাদ এন, জে হাই স্কুলের শিক্ষক স্বপন চৌধুরী, অগ্রণী ইন্স্যুরেন্সের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক লায়ন সন্তোষ নন্দী, সমন্বয় ক্লাবের প্রদীপ দাশ আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। আর যার সাহায্য সহযোগিতা ও আতিথেয়তা সবচেয়ে বেশি পেয়েছি তিনি হচ্ছেন শহীদ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিঠু ঘোষ। মুজাফরাবাদ গ্রামবাসীর আন্তরিকতা, আতিথেয়তা ভুলবার নয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের যে স্মৃতিচারণ এখানে সংকলিত হয়েছে, এর কয়েকটি তাদের স্বহস্তে লিখিত। এগুলোর ভাষা ও বানান প্রায় অবিকৃত রাখা হয়েছে। কয়েকটি স্মৃতিচারণ সংকলিত হয়েছে *সমন্বয় ক্লাব* প্রকাশিত *উত্তাল* সাময়িকী থেকে। *সমন্বয় ক্লাব* কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। এগুলোর ভাষা এবং বানানও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

আমি যখন সর্বশেষ মুজাফরাবাদ যাই তখন আমাকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য স্বেচ্ছায় ঢাকা থেকে মুজাফরাবাদ যান অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও যুবক কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, খ্যাতিমান প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক ও আমার দুই সহকর্মী তপন পালিত ও আহম্মেদ শরীফ। তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গ্রন্থ রচনার পেছনে মূল উৎসহাদাতা পরামর্শদাতা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। স্যারের মত একজন অভিভাবকের ছায়াতলে থাকাটাই জীবনের একটি বড় অর্জন। স্যারকে ধন্যবাদ জানানো কিংবা কৃতজ্ঞতা জানানোর সাহস আমার নেই। আমার দুই অগ্রজ মোরশেদ কাদের চৌধুরী ও খোরশেদ কাদের চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই, তাদের উৎসাহ আমার কাজে বড় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

সর্বোপরি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই মুজাফরাবাদ গ্রামের তিনশতাধিক শহীদদের, প্রায় দুই শতাধিক বীরাঙ্গনাদের।

পৌষ, ১৪২১

চৌধুরী শহীদ কাদের
ইতিহাস বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
shahidkcdu@gmail.com

ভৌগোলিক বিবরণ

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার একটি স্বনির্ভর ও আর্দশ গ্রাম মুজাফরাবাদ। দক্ষিণ চট্টগ্রামের একমাত্র গ্রাম, যে গ্রামে ২টি কলেজ, ২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং যেখানে শিক্ষিতের হার ৯৯%। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য আলাদা উচ্চ বিদ্যালয়, আলাদা আবাসিক কলেজ বাংলাদেশের খুব কম গ্রামেই রয়েছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে অবস্থিত এই ছবির মত সুন্দর গ্রামটির রয়েছে এক করুণ ইতিহাস। মুজাফরাবাদ, বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মতোই মামুলি একটি গ্রাম। একাত্তর সালের ২ মে পর্যন্ত তা-ই ছিলো পটিয়া থানার এই গ্রামটি। তারপর ৩ মে পাক হানাদার কবলিত বাংলাদেশের এই গ্রামে এমন একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটলো, যার ফলে সেই গ্রাম আর সামান্য গ্রাম থাকলো না। ৮ ঘন্টার বিভীষিকা সেই গ্রামটিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, পাকিস্তানি নরপশুদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করলো। পৈশাচিকতায়, বর্বরতায়, নির্মমতায়, নিষ্ঠুরতায় অসহায় নিরস্ত্র মানুষের করুণ আর্তচিৎকার, সম্ভ্রম হারানো নারীর আর্তনাদে সেই গ্রাম হয়ে গেলো মানবতার অপমানের, মানুষের চরম লজ্জার এক করুণ উপমা। বন্দুক, বেয়নেট, বোমা, মেশিনগানের অবিরাম অগ্নি উদ্‌গীরণের মুখে সাধারণ নিরীহ মানুষগুলোর খালি হাতে বীরের ন্যায় লড়ে প্রাণ বিসর্জন, সেই গ্রামটিকে অসাধারণ সাহস- শৌর্য- বীর্যের মহিমা ও অসামান্যতা দান করেছে।

মুজাফরাবাদ গ্রামকে অনায়াসে 'শহীদদের গ্রাম' বলে চিহ্নিত করা চলে। যে গ্রামের প্রতিটি পাড়া, পরিবার, ঘরে ঘরে শহীদ, প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে শহীদের রক্তকণিকা, বাতাসে বিপন্ন মানুষের ক্রন্দন আর হাহাকার, যে গ্রাম তিন শতাধিক মানুষের বধ্যভূমি, সেই গ্রামের আর কোন নাম থাকা উচিত নয়, 'শহীদ পল্লী' কিংবা এ জাতীয় কোনো নামই যথোপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

পাক হানাদার বাহিনী গ্রামটাকে পরিণত করেছিলো বিশাল বধ্যভূমিতে। যখনই কোথাও এরকম বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তখন আমরা 'মাইলাই' উল্লেখ করে তার তুলনা প্রকাশ করি। সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক নাসিরউদ্দিন চৌধুরী হয়ত তাই বলছিলেন, 'মানুষের পাশবিকতার, নিষ্ঠুরতার নিদর্শন দেখার জন্য মাইলাই যাবার দরকার নেই, মুজাফরাবাদ গেলেই চলবে। পাকিস্তানিরা নাপাম মারেনি, গান পাউডার ছিটিয়ে সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। সে আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিলো গাছপালা, পশু-পাখি সমেত অসংখ্য মানব শরীর।'

১৯৭১ সালে মুজাফরাবাদ

মুজাফরাবাদ গ্রামের অবস্থান চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নে। তৎকালীন ১৭নং খরনা ইউনিয়নে ওয়ার্ড ছিল তিনটি। মুজাফরাবাদ গ্রামটি ছিল ৩নং ওয়ার্ড। পটিয়া উপজেলা শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী এই গ্রামটি ছিল মূলত হিন্দু অধ্যুষিত। ১৯৭১ সালে এই গ্রামে ৭৯২টি পরিবারের বসবাস ছিল। মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ হাজারের কিছু বেশি। তবে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮০০। গ্রামে মুসলিম পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩টি, বাকি প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। গ্রামের লোকদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি। তবে এর

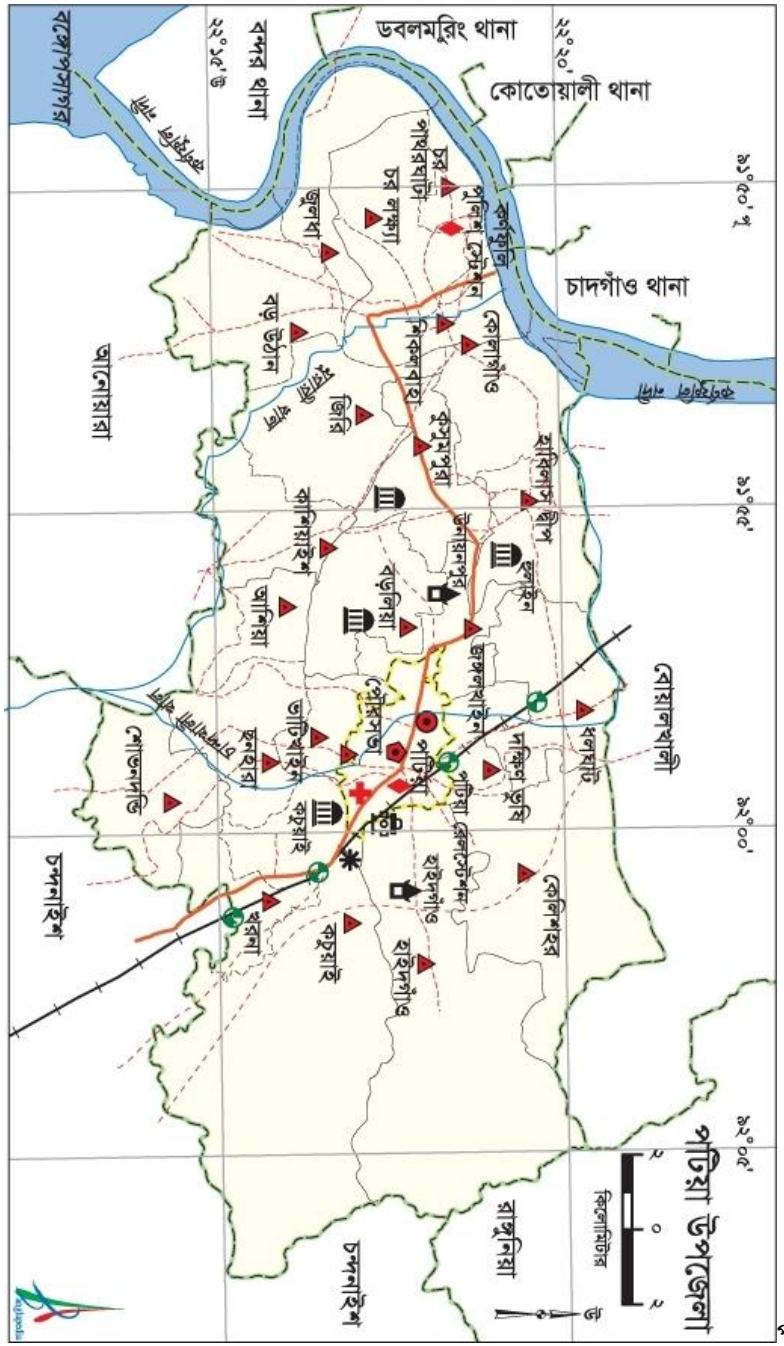

পাশা

পাশি এই গ্রামে নানা পেশার লোক ছিলেন। বিশেষ করে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। আশেপাশের গ্রামের স্কুলগুলোর অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন মুজাফরাবাদের।

বর্তমানে যে খরনা খাল, সেটি একসময় ছিল ছড়া। পাহাড়ের কোল থেকে বয়ে চলা এই খরনা ছড়া থেকে ইউনিয়নের নাম হয় খরনা। মুজাফরাবাদ গ্রামের নামকরণের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে জনশ্রুতি আছে মুজাফফর নামক এক মুসলিম ভদ্রলোকের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। পূর্বে এই গ্রাম ছিল পুরোপুরি হিন্দু অধ্যুষিত। জনাব মুজাফফর সর্বপ্রথম এই গ্রামে মুসলিম বসতি স্থাপন শুরু করেন। পরবর্তীতে গ্রামে প্রচুর মুসলিম বসতির সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হয় তিনি মুঘল সেনাবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

বর্তমানে মুজাফরাবাদ

বর্তমানে মুজাফরাবাদ পটিয়া উপজেলার ১৭নং খরনা ইউনিয়নের একটি স্বর্নিভর ও আদর্শ গ্রাম। খরনা ইউনিয়নের আয়তন ৯ বর্গ কিঃ মিঃ। এর বর্তমান চেয়ারম্যান মফজল আহমদ চৌধুরী। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ এর মত। মুজাফরাবাদের জনসংখ্যা প্রায় ৬,০০০। এই ইউনিয়নের ৮টি গ্রামের মধ্যে মুজাফরাবাদের আয়তন ও লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই গ্রামে বর্তমানে ২টি কলেজ রয়েছে, যথা- মুজাফরাবাদ কলেজ ও মুজাফরাবাদ যশোদা নগেন্দ্র নন্দী মহিলা ডিগ্রী কলেজ। যাতে প্রায় ১২০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এছাড়া রয়েছে মুজাফরাবাদ এন.জে উচ্চ বিদ্যালয় ও মুজাফরাবাদ বালিকা বিদ্যালয় নামে ২টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। রয়েছে ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেশ কয়েকটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর মধ্যে মুজাফরাবাদ সমাজকল্যাণ সংস্থা অন্যতম। এছাড়া রয়েছে বিবেকানন্দ সংঘ। সবগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে রয়েছে আবার 'সমন্বয় ক্লাব'।

১৭ নং খরনা ইউনিয়ন পরিষদ

ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, ভিটা, নারী উন্নয়ন সংস্থা, ঘরণী, আশা এই ৬টি এনজিও গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছে। গ্রামে শিক্ষার হার প্রায় শতভাগ। জনগণের প্রধান পেশা কৃষি। অধিকাংশ পরিবার মূলত শহরকেন্দ্রিক। তবে সবার গ্রামের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী রাণী প্রভা চৌধুরী, মুজাফরাবাদের প্রথম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নরেন্দ্র ঘোষ রায়, স্বর্গীয় যাত্রামোহন চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তাপসী ঘোষ রায়, প্রদীপ ঘোষ এই গ্রামের খ্যাতিমান ব্যক্তি।

গণহত্যা-নির্যাতনের পটভূমি

২৫ মার্চের কালোরাত্রির পর থেকে মুজাফরাবাদ গ্রাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এই গ্রামের লোকজন বেশ কয়েকবার এই সময় আরাকান সড়ক অবরোধ করেন। পটিয়ার বাঙালি সেনা ক্যাম্পে নিয়মিত চাল-ডাল ও অন্যান্য খাবার সরবরাহ করত এই গ্রামের তরুণ-যুবকরা। এলাকার তরুণরা সংগঠিত হয়ে এই সময় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অনেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান গেরিলা প্রশিক্ষণ নিতে।

অনেকেই পটিয়া কলেজে মুক্তি ক্যাম্পে গিয়ে নানাভাবে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করত। ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত মুজাফরাবাদ মূলত স্বাধীনভাবেই চালিত হয়েছে। তবে এই দিন পটিয়ার পতনের মধ্য দিয়ে মুজাফরাবাদসহ পুরো দক্ষিণ চট্টগ্রাম পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মুজাফরাবাদ গ্রামে লোকজন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামে শান্তি বাহিনীর লোকজনের আনাগোনা বেড়ে যায়।

মুজাফরাবাদ গ্রামের তরুণরা রাতে ২০টি জায়গায় পাহারা বসায়, প্রতিটি গ্রাম সীমান্তের পাহারা কেন্দ্রে ২০ জন করে তরুণ রাত জেগে পাহারা দেয়া শুরু করে। প্রতিটি পাহারা কেন্দ্রে কাঁসার থালা রাখা হয়। যাতে কোন আক্রমণ হলে কাঁসা বাজিয়ে সবাইকে সংগঠিত করা যায়। ২০ এপ্রিল শান্তি কমিটির লোকজন মুজাফরাবাদ গ্রামের প্রবেশমুখে তমালতলা আশ্রমে আগুন লাগিয়ে দেয়। মূলত এই ঘটনার পর থেকে মুজাফরাবাদের লোকজন অনেক বেশি আতঙ্কিত ও সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা তাদের হয় না।

পটিয়ার পতন

১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল পটিয়ার পতন ঘটে। এদিন পাকবাহিনী পটিয়ার বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায়, ব্যাপক আক্রমণ করা হয় পটিয়া কলেজ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। পাকিস্তানি বিমান বাহিনী এইদিন পটিয়ার উপর বোমাবর্ষণ করে। মূলত পটিয়া পতনের মধ্য দিয়ে পুরো দক্ষিণ চট্টগ্রাম পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। পটিয়া পতনের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়িবহর যখন মুজাফরাবাদের পাশে আরাকান রোড দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাস্তার পাশে যাকে যেখানে দেখেছে তাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কিন্তু মিলিটারী গাড়িবহর রৌশনহাট পৌছার পর আচমকা সেখান থেকে মুজাফরাবাদ গ্রামের উপর শেলিং শুরু হল। গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। সেদিনের শেলিংয়ের স্পিন্টারের আঘাতে দক্ষিণ পাড়ার এক বৃদ্ধা আহত হয়। আচমকা এই আক্রমণ সম্পর্কে দুলাল কুমার সরকার বলছিলেন, 'সেদিন শেলিং এর উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম থেকে কোন গুলি-গোলার সাড়া পাওয়া যায় কি না। কারণ পাক সেনাদের ধারণা দেওয়া হয়েছিল মুজাফরাবাদ গ্রামে সবাই হিন্দু, সবাই আওয়ামী সমর্থক। এখানে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক জোয়ান লুকিয়ে আছে এবং গ্রামের যুবকদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। প্রচুর অস্ত্র আছে এই গ্রামে'। কিন্তু মুজাফরাবাদ গ্রাম থেকে সেদিন পাল্টা কোন আক্রমণ না হওয়ায় পাক বাহিনী চলে যায় দোহাজারীতে।

গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ

৩ মে ১৯৭১। সেদিন ছিল সোমবার। আগের রাতের হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির রেশ তখনো লেগেছিল মুজাফরাবাদ গ্রামে। রাতভর পাহারা দেয়ার পর গ্রামের তরুণ-যুবারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বয়স্ক পুরুষরা যারা রাতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঝোপের আড়ালে কিংবা পুকুর পাড়ে রাত কাটায় তারাও ফিরে এসেছে ঘরে। আগের দিন রাতে স্থানীয় শান্তি কমিটির লোকজন বলে যায়, আগামীকাল গ্রামবাসীকে নিয়ে একটি মিটিং করা হবে। কিভাবে এই হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামকে পাক আক্রমণ থেকে রেহাই দেয়া যায় সেটাই হবে আলোচ্য বিষয়। মিটিংটিকে সামনে রেখে গ্রামের অধিকাংশ লোকই মোটামুটি নিরাপদ আশ্রয় থেকে সকালে বাড়িতে ফিরে আসে।

সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিট, সময়টা ঠিক ঠিক স্মরণ করে অশীতিপর শিক্ষক আশুতোষ দত্ত বলেন, তখন আকাশবাণীর খবর শুনছিলাম। এমন সময় চারদিক থেকে প্রচণ্ড শোরগোল। হৈ চৈ ভয়ার্ত কণ্ঠের আর্তচিৎকার ও শিশুদের কান্নার রোলের মধ্যে শোনা গেল "পাঞ্জাবি আইস্যে" (পাঞ্জাবি এসেছে) "ধ ধ" (পালাও পালাও) রব। তারপর সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে খৈ ফোটার মত অবিরাম গুলি বর্ষণের শব্দ। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় (যারা আগের দিন মিটিং এর কথা বলে গিয়েছিল) পাক বাহিনী গ্রামটিকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। গ্রামের পূর্বদিকে আরাকান সড়কে বসায় ভারি ভারি ৬টি কামান, গ্রামের উত্তর সীমান্ত রাস্তা তমালতলা আশ্রমের সামনে দিয়ে পশ্চিমের দিকে শেষ সীমান্ত পর্যন্ত মেশিনগান বসিয়েছে যাতে গ্রাম থেকে কোন লোক পূর্ব ও উত্তর দিকে পালাতে না পারে। অন্যদিকে গ্রামের পূর্ব দক্ষিণ সীমান্ত ছাড়া বটতলা দিয়ে ভারী মেশিনগান ও এলএমজি নিয়ে পাক হানাদারেরা গ্রামকে ঘিরে ফেলে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত, যাতে কেউ গ্রামের দক্ষিণ দিকে পালাতে না পারে। গ্রামের পশ্চিম দিকটা খোলা ছিল যা দিয়ে শত শত লোক ঐ দিন প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। হানাদার বাহিনী গ্রামের তিন সীমান্ত ঘিরে মুজাফরাবাদের মূল রাস্তা দিয়ে ভারী অস্ত্রসহ জিপ নিয়ে ঢুকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মোট তিনটি জিপ নিয়ে পাক বাহিনী দোহাজারি ক্যাম্প থেকে মুজাফরাবাদ গ্রামে আসেন। শতাধিক পাক সৈন্যের সাথে প্রায় পঞ্চাশজন স্থানীয় রাজাকার এই পৈশাচিক অভিযানে অংশ নেন।

রীতিমতো যুদ্ধের সাজে এবং যুদ্ধ করার মত প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল তারা। তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, মুজাফরাবাদ গ্রাম মুক্তিবাহিনীর বিরাট ঘাঁটি এবং ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে গ্রামটিকে একটি দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত করা হয়েছে। এখানে বেশ কিছু তরুণকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। স্থানীয় রাজাকারদের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু

সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই ছোট্ট শান্ত জনপদটিকে লুটপাট চালানো। তাই মিথ্যে গুজব রটিয়ে ও অসত্য তথ্য দিয়ে পাক বাহিনীকে প্ররোচিত করা হয়েছিল এই গ্রাম আক্রমণে।

তবে আক্রমণের সময় নিয়ে মতদ্বৈততা আছে। অনেকে এই সময়টাকে সকাল ৬টা কিংবা সোয়া ৬টা বলছেন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার সবকিছু মিলিয়ে সময়টা সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি।

পাক হানাদার বাহিনী প্রায় দুপুর ২টা পর্যন্ত এই গ্রামে অবস্থান করেন। প্রায় ৮ ঘন্টা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে পাক হানাদার বাহিনী গ্রামের প্রায় ৩০০ লোককে হত্যা করে, জ্বালিয়ে দেয় প্রায় ছয় শতাধিক ঘরবাড়ি, ধর্ষণ করা হয় প্রায় ২০০ নারীকে। যাকেই সামনে পেয়েছে তাকেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

গ্রামের বেশির ভাগ লোক পালিয়ে গিয়েছিলো পার্শ্ববর্তী মুসলমান প্রধান গ্রামে। বৃদ্ধ, নারী, শিশুদের রক্ষায় কিছু সাহসী তরুণ ও যুবক থেকে গিয়েছিল। কিন্তু নরপশুরা কাউকে রেহাই দেয়নি। খালে-বিলে-পুকুরে-ঝোঁপে-ঝাড়ে, খড়ের গাদায়, গোয়াল ঘরে, পবিত্র উপাসনালয়ে, ঘরের ছাদে অনেক মানুষ লুকিয়ে পার পাবে ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু রাজাকারদের সহায়তায় প্রত্যেকটি গুপ্তস্থান থেকে পাকিস্তানিরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনে লুকানো বাঙালিদের, তারপর গুলি করে হত্যা করা হয় তাদের। দু'একটি ঘরে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রাখা হয়েছিলো বিপদ আসলে সেখানে লুকিয়ে থাকা যাবে ভেবে। কিন্তু সেখানও লুকিয়ে জান বাঁচাতে পারেনি কেউ। হানাদাররা সুড়ঙ্গে গ্রেনেড ফাটিয়ে কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে গুলি করে কিংবা আগুনের জ্বলন্ত মশাল ঢুকিয়ে সে সব অসহায় মানুষকে হত্যা করেছে কিংবা পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিয়েছে। সেসব ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার ফলে ভেতরে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে যায় বহু নর-নারী। মন্দিরে উপাসনারত, গীতাপাঠরত পূজারী, নিষ্পাপ নির্বোধ বৃদ্ধের মুখে, মলদ্বারে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে গুলি করলো, তারা উড়ে গিয়ে লাশ হয়ে পড়ল। জবাই করা হয় অনেককে। রক্তে ভেসে যায় মুজাফরাবাদের মাটি। সে এক হৃদয়বিদায়ক দৃশ্য।

মধ্যপাড়ার সংসারত্যাগী নবীন বৈদ্য গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গীতা পাঠ করে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতো। বয়োবৃদ্ধ এই সাধুকে মিলিটারিরা ধরে বলল "বলো জয় বাংলা" শান্ত ও সরল বিশ্বাসী নবীন বৈদ্য স্পষ্টই 'জয় বাংলা' বলল ঠিক তখনিই তাঁর মুখের ভেতরে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে গুলি করে দেয়া হয়। নবীন বৈদ্য ছিলেন মুজাফরাবাদের নামকরা সাধু, তাঁর বাবার নাম যতীন্দ্র বৈদ্য।

এইভাবে মুখের ভিতর বন্ধুকের নল ঢুকিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে পূর্ব পাড়ার বয়োবৃদ্ধ রজনী সেনকে। মধ্য পাড়ায় ধরা পড়লো নির্মল সেন ও তাঁর বাবা উপেন্দ্র সেন, ক্ষেত্রমোহন মজুমদার, অন্নচরণ বৈদ্য, ক্ষেমেশ চৌধুরী, সত্য রঞ্জন কর, রায় মোহন চৌধুরী প্রমুখ। তাঁদের ধরে অমানুষিক নির্যাতন করেছে। তারপর যাকে যেখানে খুশী কুকুর-শৃগালের মতো গুলি করে হত্যা করেছে। প্যারী মোহন দাশের বাড়িতে ঘরের টিন জ্বলে জ্বলে লাল হয়ে গেছে। ক্ষেত্র মোহনকে সেই জ্বলন্ত টিনের উপর নিক্ষেপ করেছে। পরে তাকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছে। আরো কয়েকজনের আধপোড়া গুলিবিদ্ধ লাশ মধ্যপাড়া শ্যামাচরণ মহাজনের বাড়িতে পড়েছিল। এছাড়া রাস্তার ধারে, খালের ধারে, পুকুর পাড়ে যেখানে সেখানে আরো কত শত শহীদের বিকৃত লাশ পড়েছিল। রায়মোহন বিশ্বাস, যিনি মুজাফরাবাদ গ্রামে রায়মোহন মাস্টার নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। নিজ গ্রামের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ছিল অনন্য ভূমিকা। পূর্ববর্তী সারারাত গ্রামে পাহারা দিয়ে তিনি জাল নিয়ে বাড়ির পাশে মাছ ধরতে যান ভোরে। পরনে লুঙ্গি, কোমরে গামছা ও হাতে জাল, এমনি অবস্থায় পাকিস্তানিরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। রাজাকাররা তাঁকে সনাক্ত করে একজন 'শিক্ষক' ও 'হিন্দু' বলে। একথা শুনে সৈন্যরা কোমরের গামছা খুলে নিয়ে তাঁকে দুহাত বেঁধে স্ত্রী-কন্যাদের সামনে গুলি করে

হত্যা করে। এমনকি তার দুই জ্ঞাতি ভাই রাজবিহারী বিশ্বাস ও প্রাণহরি বিশ্বাস সৈন্যদের কাছে তাঁর প্রাণভিক্ষা চান। জানোয়াররা তাদেরকেও একসাথে গুলি করে হত্যা করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে মুজাফরাবাদের মাঝের রাস্তাটি তাঁর নামে 'রায়মোহন বিশ্বাস সড়ক' নামকরণ করা হয়। তাঁর ভাইপো আশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সমর কান্তি বিশ্বাস এই হত্যা সম্পর্কে বলছিলেন, 'একজন রায়মোহন মাস্টারকে ধ্বংস করে রাজাকারেরা ভেবেছিল এ গ্রামে মাস্টারের জন্ম হবে না। কিন্তু তাঁর রক্তের স্রোতে দাড়িয়ে শত সহস্র মাস্টার জন্ম নিচ্ছে এ গ্রামে'।

স্বর্গীয় যাত্রামোহন চৌধুরীর সন্তান ছিলেন রায়মোহন চৌধুরী ।

মুজাফরাবাদ গণহত্যায় নির্যাতিত শোভা রানী কর

শোভা জানালেন তাঁর পিতা সত্যরঞ্জন কর ও মামা রোহিনী দত্তের হত্যাকাণ্ডের মর্মন্তুদ কাহিনী। তার মামা রোহিনী দত্ত এলাকার বড় পুকুরে শাড়ি পড়ে নাক উঁচু করে ডুবেছিলেন। সেভাবেই তাকে বৃষ্টির মত গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানিরা। পুকুরে ভেসে ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল সেই লাশ। একদিন পর তুলে তাঁর সৎকার করা হয়। হারাধন বৈদ্যের পিতা মনীন্দ্র বৈদ্যও একভাই লুকিয়েছিলেন খাল পাড়ে। বেলা ১২টার সময় দু'জনকে একসাথে হত্যা করা হয়। রত্না রাণী চৌধুরীর শাশুড়ি অবলা বালা চৌধুরীকেও পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করা হয়। মজুমদার বাড়ির দশ-পনেরো জন সাহসী পুরুষ দা, ছুরি, খড়গ নিয়ে হানাদারদের ঠেকাতে চেষ্টা করেন। তাদের সাথে যেন ইঁদুর-বেড়াল খেলায় মেতে উঠে হানাদাররা। অবশেষে যখন তাদের প্রতিরোধ থেমে যায়, হানাদাররা বাংলার সূর্যসন্তানদের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয় একে একে। তাঁদেরসহ শতাধিক মানুষের ছিন্নভিন্ন শবদেহ গাদাগাদি করে সমাহিত করা হয় একটি গণকবরে। ডা. মিলন সেনের বাড়ির সুরেন্দ্র সেন তাঁর শিশুপুত্র দীপক সেনকে জড়িয়ে ধরে বাঁচাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঘাতকরা এক গুলিতে পিতা-পুত্র দুজনকে শেষ করে দেয়। পিতার শরীরের মধ্য দিয়ে শিশুকেও ভেদ করে চলে যায় গুলি। সুদর্শন সেনের বাড়ির ষাটোর্ধ বৃদ্ধা মিনতি সেন তাঁর তাগড়া জোয়ান পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র সেনকে বাঁচাতে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন, এক গুলিতে দুজন একসঙ্গেই ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। উত্তর মুজাফরাবাদের তিন সহোদর নিকুঞ্জ দাশ, অশ্বিনী দাশ ও বনমালী দাশকে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। সেখান থেকে বনমালী কোনমতে বেঁচে যান। কয়েকজন পূজারীকে ধরে বেঁধে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদেরকে মন্দিরের সব বিগ্রহ একে একে ভেঙে ফেলতে বলা হয়। প্রাণ বাঁচাতে তারা তা-ই করে। তবু কাপুরুষ, পাষণ্ডদের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক করতে পারেনি তারা। ধ্বংসযজ্ঞ শেষে তাদেরকেও বলি দেওয়া হয়। মা ও মেয়েকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে তারপর গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে নরঘাতকরা। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে থাকলে আত্মগোপনকারী স্বামী সহ্য করতে না পেরে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই খালি হাতে ঝাপটে ধরে পাকসেনাকে এবং আছড়ে মারার মুহূর্তে আরেক পাকসেনার গুলিতে ঢলে পড়েন স্বামী। ওদিকে স্ত্রীর সর্বস্বহরণ করে তাঁকেও মেরে ফেলে দেয়া হয় স্বামীর লাশের

পাশে। মানুষের জীবনকে নিয়ে তারা যে কী নির্মম রসিকতায় মেতে উঠেছিল তার একটি প্রমাণ হচ্ছে, একটি ঘরে অনেক নারী-পুরুষকে আটকে রেখে রাইরে থেকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে তারা। মানুষ পোড়ার গন্ধে যখন বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল, তখন জানোয়ারদের সে কী উল্লাস আর অট্টহাসি।

একজন সাহসী যুবক নির্মল সেন। হানাদার বাহিনীর হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য লুকিয়েছিলেন ঝোপের মধ্যে। হানাদাররা চলে গেছে মনে করে, সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি উপেন্দ্র নাগের বাড়িতে উঁকি দেন। তিনি দেখলেন, সেখানে পাকিস্তানি জানোয়াররা কয়েকজন মহিলার ইজ্জত লুটের চেষ্টা করছে, আর একজন জানোয়ার অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিচ্ছে। সেন আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রহরারত জানোয়ারটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরাশায়ী করলেন এবং মারতে মারতে তাকে একেবারে জানে খতম করার জন্য নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বিধি বাম, এ সময় উপেন্দ্র নাগের ঘরের ভেতর নারী নির্যাতনে লিপ্ত দু'তিনজন পাকসেনা তা দেখে ফেলে। তারা বেরিয়ে নির্মল সেনকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তাদের সঙ্গীকে উদ্ধার করে। পাকিস্তানিরা নির্মল সেনের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করলে পার্শ্ববর্তী ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পিতা উপেন্দ্র সেন তা সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে এসে তাঁর ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইলেন জল্লাদদের কাছে। কিন্তু পাক বাহিনী পিতা ও পুত্রকে এক সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। নির্মল সেনের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে উত্তর বিলে।

শংকর সেন গ্রামের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় সমাজকর্মী। তিনি পালিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা পালাতে পারেনি। তাদের আনতে গিয়ে ধরা পড়লেন মিলিটারীর হাতে। নির্মমভাবে হত্যা করা হলো তাকে। দত্ত পাড়ার বীরেন্দ্র দত্ত, কামিনী দত্ত, সারদা সেন ও কালী কুমার দত্ত সহ আরো কয়েকজনের লাশ পড়েছিল দত্ত পাড়ার দক্ষিণে বড় পুকুরের পাড়ে। দক্ষিণ পাড়ার নিরঞ্জন বিশ্বাস লুকিয়ে ছিলেন খাটের নীচে। কিন্তু চোখের সামনে নিজের মেয়েকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি বের হয়ে মিলিটারীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। নির্মম পশুর দল তাঁকে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করেছে। পশ্চিম পাড়া থেকে সুরবালা নামে এক বিধবা তার ১৫-১৬ বছরের প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে পূর্ব পাড়া আসার পথে দুজনকেই গুলি করে হত্যা করে। মৃত মায়ের বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল ছেলের তরতাজা লাশ। মধ্যপাড়ার সুরেন্দ্র সেন তার ছেলেকে কোলে নিয়ে পালাচ্ছিল। পিতা পুত্র দুজনকেই গুলি করে হত্যা করল নরপশুর দল। পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে পড়েছিল গুলিবিদ্ধ লাশ। কোনটা বিকৃত, কোনটা অবিকৃত।

মহুরী বাড়ির নিরঞ্জন চৌধুরী পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়লো নিকুঞ্জ মাস্টারের বাড়ির সামনে, যেখানে বর্তমানে লোকনাথ মন্দির ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে খুব কাছে থেকে সামনা সামনি গুলি করে পাক বাহিনী। গুলি তার বুকের দিকে ঢুকে পিঠের দিকে বেরিয়ে গেছে। রক্ত গঙ্গায় ডুবে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন, "আমি মারা যাচ্ছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে; তাই অতিকষ্টে পশ্চিম থেকে উত্তর শিয়র হয়ে মরার মতো পড়ে থাকলাম। এর মধ্যে কয়েকবার মিলিটারী এসেছে এবং মৃত ভেবে আমাকে পা দিয়ে উল্টিয়ে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর বকা পিসিকে দেখতে পেলাম। বকাপিসি মানে স্বর্গীয়া সৌদামিনী বিশ্বাস। তিনি ভেবেছেন নিরঞ্জন মারা গেছে। তখন আমি জল জল করে কাতরাচ্ছি। বকা পিসি কাছে আসলে বললাম, 'পিসি আমি মরিনি। আমাকে একটু জল দাও'। বকা পিসি হন্তদন্ত হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে পুকুরে নেমে তাঁর আঁচল ভিজিয়ে পানি এনে আমার মুখে দিল। তার লোকজন এসে আমাকে পশ্চিম পাড়া আমার বোনের বাড়িতে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর ডাঃ দেশবন্ধু এসে আমার ক্ষতের ভিতর বালিশের তুলা ঢুকিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।"

এভাবে ৮ ঘন্টা ধরে হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালানোর মাধ্যমে সবকিছু তছনছ করে বিকেল চারটার দিকে গ্রামটিকে রেহাই দিয়ে প্রস্থান করে পাকবাহিনী। পেছনে বিধ্বস্ত গ্রামটিতে কবরের নীরবতা বিরাজ করছিলো। তখনো থেকে থেকে আগুনের ধোঁয়া উঠছিলো কোন কোন বাড়ি থেকে। কান পাতলে শুধু শোনা যাচ্ছিলো বিলম্বিত কান্না, হাহাকার ও আর্তি। তবু সময় থেমে থাকে না, যতই দুঃখের, বেদনার বিভীষিকার, যাতনাময় হোক না কেন সে দিবসরজনী, তাও এক সময় সয়ে আসে, ফুরিয়ে যায়। এমনিভাবে মুজাফরাবাদেও অবসান হলো সবচেয়ে কলঙ্কজনক, ভয়াবহতম এক দিনের। কিন্তু তখনো দুঃখের বাকি ছিলো মুজাফরাবাদবাসীর জীবনে। রাত পোহাতে না পোহাতেই সদলবলে হাজির পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকাররা। তখনো যারা জীবন্মৃত, অর্ধমৃত হয়ে বেঁচেছিলো গ্রামটিতে, রাজাকাররা এসে চূড়ান্ত আঘাতটি হানলো তাদের ওপর। তারা জবাই করে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দফারফা করতে থাকে অবশিষ্ট মানুষগুলোর। বরদা মাস্টারের বাড়ির উপেন্দ্রলাল চৌধুরীকে তারা পিটিয়ে হত্যা করে, ছাদ থেকে ফেলে দেয়। ঐ বাড়ির নতুনচন্দ্র চৌধুরীকেও একই কায়দায় হত্যা করা হয়। ইতোমধ্যে লাঞ্ছিত, অপমানিত মা-বোনদের তারা দ্বিতীয় দফা নির্যাতন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। আর দিনভর চলে তাদের লুটপাট। তাদের অত্যাচার চরমে পৌঁছালে নিরুপায় গ্রামবাসীরা অবশেষে পূর্ব পুরুষদের বাড়ি ভিটা, সহায়সম্পদ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। সেই যাত্রায়ও অনাহারে অর্ধাহারে পথশ্রমে রোগে ভুগে অনেকে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

গণহত্যার মূল পরিকল্পনাকারী

মুজাফরাবাদ গণহত্যার ৪৩ বছর পর আমি মুজাফরাবাদ গ্রামে যাই। গ্রামের লোকজনের সাথে যখন কথা হচ্ছিল 'কে এই গণহত্যার পেছনে ইন্ধন দিয়েছে'। সবার একই উত্তর মুসলিম লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী একজন নেতা। কিন্তু অবাক বিষয় কেউ নামটা মুখে আনছেন না। মুজাফরাবাদ গণহত্যা স্মরণে স্থানীয় 'সমন্বয় ক্লাব' ২০১০ সালে একটি স্মরণিকা বের করে। এতে ১৭ জন স্থানীয় ব্যক্তির লেখা প্রকাশিত হয়। এতে অধিকাংশ লেখকেই এই বর্বরোচিত গণহত্যার নায়ক হিসেবে স্থানীয় প্রভাবশালী এক মুসলিম লীগ নেতার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু নামটি লেখার সাহস স্বাধীনতার ৪ দশক পরেও মুজাফরাবাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাননি। মুজাফরাবাদের সাধারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে মানুষটির নাম মুখে আনতে ভয় পাচ্ছে, তার নাম রমিজ আহমেদ চৌধুরী। তৎকালীন মুসলিম লীগের পটিয়া অঞ্চলের সভাপতি ও খরনা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান।

মূলত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে কিছু বিষয় নিয়ে মুজাফরাবাদের গ্রামবাসীর সাথে তাঁর তিক্ততা শুরু হয়। অ্যাডভোকেট রমিজ আহমদ চৌধুরী ০১-০৭-৬১ থেকে ৩১-১২-১৯৬১ পর্যন্ত মুজাফরাবাদ এন, জে উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই সময় তিনি বিদ্যালয়ের নাম সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি ছিল স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গীয় যাত্রামোহন চৌধুরী ও ব্যবসায়ী আলহাজ্ব নুরুজ্জামান সওদাগরের নামে। প্রথমজন বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন, দ্বিতীয়জন জরাজীর্ণ বিদ্যালয়টিকে নতুনভাবে সংস্কার করেন। যেই কারণে এলাকাবাসী স্কুলের নামকরণ করেন মুজাফরাবাদ এন, জে উচ্চ বিদ্যালয়। রমিজ আহমেদ এই সময় এন, জে এর সাথে নিজ নামের আদ্যাক্ষর 'আর' সংযোজন করাতে চান। এটা নিয়ে এলাকার যুব সম্প্রদায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তাদের প্রতিবাদের মুখে একাজ আর সম্ভব হয়নি। এর ফলে গ্রামবাসীর প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের জন্ম নেয় রমিজ আহমেদের মনে।

সেটি আরো তীব্রতর হয় ১৯৭০ সালে আরেকটি ঘটনায়। এই গ্রামে ছিল 'খরনা ইউনিয়ন মাল্টিপারপাস' নামে একটি ব্যাংক। এই ব্যাংকে পাকিস্তানি পতাকা

অবমাননার অভিযোগ এনে ব্যাংক ম্যানেজার অমূল্য সেনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন মুসলিম লীগ নেতা রমিজ আহমদ। এর জের ধরে অমূল্য রঞ্জন সেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, জেল হাজতে প্রেরণ করে। পরে তদন্তে সবকিছু মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু রমিজ মিয়া বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেননি। গ্রামবাসীকে শায়েস্তা করার একটি সুযোগ তিনি খুঁজতে থাকেন। ১৬ এপ্রিল পটিয়া পতনের পর পাক বাহিনী যখন আরাকান সড়ক হয়ে দোহাজারির দিকে যাচ্ছিল তখন তাদেরকে এই গ্রামটি সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়ে উস্কানি দিয়েছিল রমিজ মিয়া ও তাঁর লোকজন। যে কারণে তারা নিরাপদ দূরত্ব থেকে শেলিং করেন এই গ্রামের উপর।

তার নির্দেশেই ২০ এপ্রিল জ্বালিয়ে দেয়া হয় স্থানীয় তমালতলা আশ্রম। রমিজ আহমদ ও তার সঙ্গীরা পটিয়া ও দোহাজারী ক্যাম্পের পাকিস্তানি কমান্ডারদের বুঝাতে সক্ষম হয় এই গ্রামে মুক্তিবাহিনীর বিশাল ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে। ভারত থেকে সীমান্ত দিয়ে প্রচুর অস্ত্র এনে এই গ্রামে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানি কমাণ্ডারদেরকে জানানো হয় হিন্দু অধ্যুষিত এই গ্রামটিতে বেশ কিছু সুন্দরী যুবতী রয়েছে। মূলত রমিজ মিয়া ও তার সঙ্গীদের এই প্ররোচনায় দোহাজারী ও পটিয়ার পাক সেনাক্যাম্প যৌথভাবে ৩ মে মুজাফরাবাদ গ্রাম আক্রমণ করে। রমিজ মিয়া জানতেন এলাকার যুবকরা আক্রমণের ভয়ে গ্রামে থাকেন না। তাই ৩ মে একটি মিথ্যে মিটিংয়ের ঘোষণা দেয়। যাতে গ্রামের যুবকরা ঘরে ফিরে আসে।

৩ মে রমিজ মিয়ার প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয় মুজাফরাবাদ গ্রাম। প্রায় তিনশ নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে পাকবাহিনী। ধর্ষণ ও নির্যাতন করা হয় প্রায় ২০০ নারীকে। বাবার সামনে মেয়েকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়। পাকবাহিনীর সাথে সাথে এই নির্যাতন ও লুটপাটে অংশ নেয় রমিজ মিয়ার অনুসারীরা। ৩ মে বিকালে রমিজ মিয়া মুজাফরাবাদ গ্রামের সামনে আরাকান সড়কে দাঁড়িয়ে বলছিল, 'এত তুন পচিম পাড়া দেহা ন যার ক্যা' (এখান থেকে পশ্চিম পাড়া দেখা যাচ্ছে না কেন) অর্থাৎ পাকবাহিনী কী জ্বালিয়েছে কিছু গাছের কারণে তিনি পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন না।

এছাড়াও স্থানীয় রাজাকার নুরু বক্স ও রমিজ মিয়ার সহকারি হিসেবে সুলতানের নাম প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে।

শহীদদের তালিকা ও পরিচয়

৩ মে ১৯৭১ মুজাফরাবাদ গণহত্যায় ৮ ঘন্টায় পাক বাহিনী তিনশ'র অধিক গ্রামবাসীকে হত্যা করেন। তিন বছরের শিশু থেকে শুরু করে শতবর্ষী বৃদ্ধা কেউ রেহাই পাননি পাকবাহিনীর বর্বরতা থেকে। শহীদের মধ্যে একশ-র কাছাকাছি নারী। যাদের অধিকাংশই মৃত্যুর পূর্বে পাকবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তিনশ'র অধিক শহীদের মধ্যে ২৫৫ জন শহীদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিচে তাদের তালিকা তুলে ধরা হল:

ক্রমিক	শহীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম
১	রায় মোহন বিশ্বাস	কামিনী বিশ্বাস
২	রাজ বিহারী বিশ্বাস	মঙলা বিশ্বাস
৩	শংকর সেন	সৌরেন্দ্র সেন
৪	রূহিনী দত্ত	কামিনী দত্ত
৫	রায় মোহন চৌধুরী	হরিময় চৌধুরী
৬	সত্য রঞ্জন কর	দেবব্রত কর
৭	যোগেন্দ্র লাল চৌধুরী	জ্ঞানেন্দ্র লাল চৌধুরী
৮	ক্ষেমেশ চন্দ্র চৌধুরী	উমেশ চন্দ্র চৌধুরী

৯	উপেন্দ্র লাল সেন	অধীর মজুমদার
১০	নির্মল সেন	ক্ষেত্র মোহন সেন
১১	সুরেন্দ্র সেন	ওকিল চন্দ্র সেন
১২	দীপক সেন	রাজেন্দ্র সেন
১৩	উত্তম সেন	অবিরাম সেন
১৪	সুর বালা সেন	জ্যোতিন্দ্র মোহন সেন
১৫	রজনী সেন	রাম কুমার সেন
১৬	মানিক চৌধুরী	মহেন্দ্র চৌধুরী
১৭	হরিরাম চৌধুরী	তেজেন্দ্র চৌধুরী
১৮	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	রামচরণ ঘোষ
১৯	নিরঞ্জন চৌধুরী	নগেন্দ্র চৌধুরী
২০	নবীন বৈদ্য	যতীন্দ্র বৈদ্য
২১	মাস্টার বারেন্দ্র রায় চৌধুরী	বিনোদ বিহারী চৌধুরী
২২	কামিনী ঘোষ	গোবিন্দ ঘোষ
২৩	নিখিল চৌধুরী	
২৪	সারদা সেন	প্যার্টন সেন
২৫	প্রাণ হরি বিশ্বাস	হরি কৃষ্ণ বিশ্বাস
২৬	ফুলু রাণী সেন	রেবতী সেন
২৭	বীরেন্দ্র দত্ত	অশ্বিনী দত্ত
২৮	নিরঞ্জন বিশ্বাস	দশরথ বিশ্বাস
২৯	সুমতি বল	মোহন বল
৩০	সারদা সেন	দয়াল হরি সেন

৩১	বিমলা চৌধুরী	শুভ রাম চৌধুরী
৩২	সরুবালা সেন	হরি মোহন সেন
৩৩	দুলাল সেন	বাবুল সেন
৩৪	সরুবালা সেন	রঞ্জিত সেন
৩৫	নতুন ঘোষ	মিলন ঘোষ
৩৬	আজলা ঘোষ	বাদল ঘোষ
৩৭	সোনা দাশ	অরবিন্দ দাশ
৩৮	বঙ্কিম সেন	দেবেন্দ্র সেন
৩৯	অন্নচরণ বৈদ্য	বিপনী চন্দ্র বৈদ্য
৪০	কালি বালা সুন্দরী	তারা কর
৪১	কালী মোহন ঘোষ	নগেন্দ্র ঘোষ
৪২	অবলা বালা মজুমদার	মহেন্দ্র মজুমদার
৪৩	শৈলবালা চৌধুরী	শ্যামাচরণ চৌধুরী
৪৪	কুসুম বালা সেন	কালিতারা সেন
৪৫	মনিন্দ্র লাল বৈদ্য	কামিনী বৈদ্য
৪৬	মনমোহন মজুমদার	দশরথ মজুমদার
৪৭	মহেন্দ্র মজুমদার	ত্রেমোহন মজুমদার
৪৮	বীরেন্দ্র মজুমদার	ভগবান মজুমদার
৪৯	দশরথ সেন	দেবেন্দ্র সেন
৫০	নগেন্দ্র চৌধুরী	হিরেন্দ্র সেন চৌধুরী
৫১	নিরঞ্জন বৈদ্য	সূর্য বৈদ্য
৫২	মন মোহন চৌধুরী	সৌরেন্দ্র চৌধুরী

৫৩	ভগবান চন্দ্র কর	মনীন্দ্র লাল কর
৫৪	চাঁদ বালা মজুমদার	নির্মল মজুমদার
৫৫	নিয়তি বালা সেন	অন্নচরণ সেন
৫৬	যশোদা বালা কর	নির্মল কর
৫৭	হারাধন দাশ	বিপিন চন্দ্র দাশ
৫৮	অক্ষয় কুমার ঘোষ	
৫৯	যোগেশ চৌধুরী	বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী
৬০	মল্লিকা মজুমদার	খেমশ চন্দ্র মজুমদার
৬১	শ্যামাচরণ দাশ	মহেন্দ্র কুমার দাশ
৬২	কালী তারা দাশ	উত্তম দাশ
৬৩	নগেন্দ্র সেন	সুব্রত সেন
৬৪	বীরেন্দ্র সেন	মনেন্দ্র সেন
৬৫	অশ্বিনী কুমার দাশ	সৌরেন্দ্র দাশ
৬৬	নিকুঞ্জ কুমার দাশ	সুনীল কুমার দাশ
৬৭	রজনী চৌধুরী	অন্নদা চরণ চৌধুরী
৬৮	সোনা মজুমদার	মহেন্দ্র মজুমদার
৬৯	স্বর্ণবালা চৌধুরী	রসরাজ চৌধুরী
৭০	অরণ্য বালা চৌধুরী	হরেকৃষ্ণ চৌধুরী
৭১	বনমালি দাশ	সুনিল কুমার দাশ
৭২	যামিনী রঞ্জন দে	দুখী রাম দে
৭৩	অর্জুন দে	যাত্রা মোহন দে
৭৪	রুনী দত্ত	সৌরেন্দ্র দত্ত

৭৫	মিলন সেন	হরিমোহন সেন
৭৬	যাত্রা মোহন চৌধুরী	গগন চন্দ্র চৌধুরী
৭৭	সাবিত্রি বালা বিশ্বাস	রমেশ বিশ্বাস
৭৮	বিরজা বালা সেন	শ্যামাচরণ সেন
৭৯	রঞ্জিত সেন	রমেশ চন্দ্র সেন
৮০	সুরসী বালা সেন	অন্নদা চরন সেন
৮১	নিবারণ চন্দ্র ধর	সুবোল চন্দ্র ধর
৮২	নিকুঞ্জ বিহারী ধর	সুবোল চন্দ্র ধর
৮৩	ডাঃ উমেশ চন্দ্র সেন	অখিল চন্দ্র সেন
৮৪	সারদা চন্দ্র সেন	শ্যামাচরণ সেন
৮৫	নিরাদা বালা সেন	সুরেন্দ্র বিজয় সেন
৮৬	সুকেন্দু বিকাশ সেন	রজনী কান্ত সেন
৮৭	রমেশ চন্দ্র সেন	প্রাণ কৃষ্ণ সেন
৮৮	রশিক চন্দ্র সেন	মৃত্যুঞ্জয় সেন
৮৯	মহামায়া সেন	শশীভূষণ সেন
৯০	প্রফুল্লরঞ্জন রায়	শ্যামাচরণ রায়
৯১	নারায়ন চন্দ্র রায়	শ্যামাচরণ রায়
৯২	মালতী রাণী রায়	অর্পণা চরণ রায়
৯৩	রবীন্দ্র লাল ঘোষ	উকিল চন্দ্র ঘোষ
৯৪	নিরঞ্জন ঘোষ	উকিল চন্দ্র ঘোষ
৯৫	শৈল বালা ঘোষ	বেরতী রঞ্জন ঘোষ
৯৬	বিনোদনী সেন	সুরেন্দ্র বিকাশ সেন

৯৭	গীতা রাণী সেন	পাচকুড়ি সেন
৯৮	নির্মল চৌধুরী	বঙ্কিম চন্দ্র চৌধুরী
৯৯	হরিকৃষ্ণ সেন	নির্মল সেন
১০০	কামিনী চৌধুরী	মহেন্দ্র লাল চৌধুরী
১০১	রঞ্জিত সেন	দুলাল সেন
১০২	মহেন্দ্র নাথ	সূর্য কুমার নাথ
১০৩	সূর্য চৌধুরী	মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী
১০৪	মহেন্দ্র দাস	রেবতী দাস
১০৫	দেবেন্দ্র দাস	রেবতী দাস
১০৬	মহেন্দ্র চৌধুরী	মনমোহন চৌধুরী
১০৭	বীরেন্দ্র চৌধুরী	মনমোহন চৌধুরী
১০৮	কামিনী নাথ	ত্রেমোহন নাথ
১০৯	বিপিন সেন	যোগেশ চন্দ্র সেন
১১০	সুরেন্দ্র চৌধুরী রায়	মোহন চৌধুরী
১১১	হরি মোহন সেন	বীরেন্দ্র সেন
১১২	রায় মোহন দাস	নবীনচন্দ্র দাশ
১১৩	শান্তি বালা ঘোষ	দুলাল চন্দ্র ঘোষ
১১৪	মালতি রাণী রায়	রঞ্জিত রায়
১১৫	রবীন্দ্র লাল ঘোষ	নিকুঞ্জ বিহারী ঘোষ
১১৬	নিরঞ্জন ঘোষ	রমেশ চন্দ্র ঘোষ
১১৭	সুবোল চন্দ্র ধর	বিনোদ ধর
১১৮	রেবতী ঘোষ	রসিক চন্দ্র ঘোষ

১১৯	সুজিত নাথ	উপেন্দ্রলাল নাথ
১২০	উত্তম নাথ	যোগেশচন্দ্র নাথ
১২১	কুসুম বালা রায়	হরিপদ রায়
১২২	নতুন চন্দ্র রায়	প্রাণহরি রায়
১২৩	সুরশি বালা ঘোষ	উপেন্দ্র লাল ঘোষ
১২৪	অঞ্জলি ঘোষ	সত্যরঞ্জন ঘোষ
১২৫	হির বালা রায়	কালীচরণ রায়
১২৬	হরিশচন্দ্র পাল	দেবেন্দ্র পাল
১২৭	উপেন্দ্র লাল	দেবেন্দ্র চরণ পাল
১২৮	মনমোহন সেন	শ্যামাচরণ সেন
১২৯	সুরেন্দ্র লাল ঘোষ	মহেন্দ্র লাল ঘোষ
১৩০	বামা চরণ ঘোষ	কামিনী চরণ ঘোষ
১৩১	কুসুম বালা দাস	শরৎ বালা দাস
১৩২	ক্ষেত্র মোহন নন্দী	রমেশ চন্দ্র নন্দী
১৩৩	অশ্বিনী ঘোষ	চন্দ্র মোহন ঘোষ
১৩৪	নতুন চন্দ্র নন্দী	যাত্রা মোহন নন্দী
১৩৫	গগন চন্দ্র নন্দী	যোগেশ চন্দ্র নন্দী
১৩৬	যোগেন্দ্র ঘোষ রায়	ভুবন চন্দ্র ঘোষ রায়
১৩৭	কামিনী সিংহ	অশ্বণী সিংহ
১৩৮	মনিন্দ লাল ঘোষ রায়	দশরত ঘোষ রায়
১৩৯	ক্ষেত্র মোহন নন্দী	রমেশ চন্দ্র নন্দী
১৪০	নিকুঞ্জ দে	অরবিন্দু দে

১৪১	তরুণী ঘোষ	যতীন্দ্র ঘোষ
১৪২	অধীর নন্দী	তারাপদ নন্দী
১৪৩	সোনা নন্দী	রেবতী নন্দী
১৪৪	সুরেন্দ্র বিজয় চৌধুরী	কামিনী চৌধুরী
১৪৫	শিব প্রসাদ সেন	রেবতী সেন
১৪৬	মনিন্দ্র লাল নন্দী	পরেশ চন্দ্র নন্দী
১৪৭	ভুবন চৌধুরী	রাখাল চৌধুরী
১৪৮	মনমোহন গুপ্ত	ললিত কুমার গুপ্ত
১৪৯	ললিত বিশ্বাস	শিবু প্রসাদ বিশ্বাস
১৫০	শংকর কুমার সেন	প্রাণ হরি সেন
১৫১	অহি ভূষণ সেন	বিপিন চন্দ্র সেন
১৫২	প্রতাপ চন্দ্র সেন	বিপিন চন্দ্র সেন
১৫৩	ধীরেন্দ্র লাল দত্ত	অশ্বিনী কুমার দত্ত
১৫৪	রায় মোহন চৌধুরী	যাত্রা মোহন চৌধুরী
১৫৫	বনমালী চৌধুরী	বামা চরণ চৌধুরী
১৫৬	হরি মোহন দাশ	ক্ষেমেশ চন্দ্র দাশ
১৫৭	নতুন চৌধুরী	সুরেন্দ্র চৌধুরী
১৫৮	রায় মোহন চৌধুরী	যাত্রা মোহন চৌধুরী
১৫৯	অনিল চক্রবর্তী	উমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী
১৬০	নিকুঞ্জ দাশ	অন্নচরণ দাশ
১৬১	অশ্বিনী দাশ	অন্নচরণ দাশ
১৬২	নির্মল সেন	নারায়ন সেন

১৬৩	উমেশ সেন	বনমালী সেন
১৬৪	ক্ষেমশ চৌধুরী	অরণ্য চৌধুরী
১৬৫	ক্ষেত্র মজুমদার	নির্মল মজুমদার
১৬৬	শোভা রাণী চৌধুরী	হরে কৃষ্ণ চৌধুরী
১৬৭	অনীল চৌধুরী	শরৎচন্দ্র চৌধুরী
১৬৮	কালী কুমার মজুমদার	রসিক চন্দ্র মজুমদার
১৬৯	সুরেন্দ্র মজুমদার	রসিক চন্দ্র মজুমদার
১৭০	কামিনী ঘোষ	গোবিন্দ ঘোষ
১৭১	রজনী ঘোষ	নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
১৭২	বামা সুন্দরী রায়	উত্তর কুমার রায়
১৭৩	ঝুনু দে	নতুন চন্দ্র দে
১৭৪	হারিনা রাণী চৌধুরী	কামিনী কুমার চৌধুরী
১৭৫	গীতা সাধু	
১৭৬	যাত্রামোহন ঘোষ	অনিল চন্দ্র ঘোষ
১৭৭	দুলাল চন্দ্র ঘোষ	নিরঞ্জন চন্দ্র ঘোষ
১৭৮	নিখিল চন্দ্র দত্ত	স্বরূপা চরণ দত্ত
১৭৯	নমিতা রাণী দত্ত	সুবল চন্দ্র দত্ত
১৮০	নিরুদা বালা রায়	প্রাণ কৃষ্ণ রায়
১৮১	মালতী রাণী রায়	রমেশ চন্দ্র দত্ত
১৮২	শারদা চরণ দে	অকিল চন্দ্র দে
১৮৩	গীতা রাণী দত্ত	পাঁচকড়ি দত্ত
১৮৪	মাস্টার রুনী সেন	কামিনী সেন

১৮৫	চন্দ মোহন ঘোষ	নগেন ঘোষ
১৮৬	দুলাল মজুমদার	শশ মজুমদার
১৮৭	মালতী রাণী ঘোষ	সুখেন্দু বিকাশ ঘোষ
১৮৮	নিবারণ ঘোষ	রজনীকান্ত ঘোষ
১৮৯	অরবিন্দ ঘোষ	মনমোহন ঘোষ
১৯০	শারদা সেন	রাম কুমার সেন
১৯১	মানিক সেন	মহেন্দ্র সেন
১৯২	প্রাণহরি সেন	বীরেন্দ্র সেন
১৯৩	সুকুমার রায়	যতীন্দ্র মোহন সেন
১৯৪	নতুন ঘোষ	প্রাণহরি ঘোষ
১৯৪	শারদা ঘোষ	দুলাল ঘোষ
১৯৫	সোনা রায়	কামিনী রায়
১৯৬	হরি মোহন দত্ত	ক্ষেমোহন দত্ত
১৯৭	নতুন চন্দ্র পার	রায়মোহন পাল
১৯৮	যাত্রা মোহন দত্ত	উমেশ চন্দ্র দত্ত
১৯৯	অশ্বিনী সেন	সুরেন্দ্র সেন
২০০	অনিল চন্দ্র দাশ	অখিল চন্দ্র দাশ
২০১	কালী কুমার দাশ	রেবতী দাশ
২০২	শোভা রাণী পাল	সুরেন্দ্র লাল পাল
২০৩	রাম চরণ ঘোষ	সুরেন্দ্র লাল ঘোষ
২০৪	নিরঞ্জন চৌধুরী	গোবিন্দ চৌধুরী
২০৫	নতুন চন্দ্র ঘোষ	বনমালী ঘোষ

২০৬	নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস	নগেন্দ্র বিশ্বাস
২০৭	রজনী পাল	উত্তম পাল
২০৮	কামিনী পাল	উত্তম পাল
২০৯	গীতা রায়	উমেশ রায়
২১০	শোভা রায়	ত্রেমোহন রায়
২১১	শান্তা চৌধুরী	নারায়ণ চৌধুরী
২১২	অন্নদা চৌধুরী	কামিনী চৌধুরী
২১৩	ষষ্ঠী চরণ দাশ	নিকুঞ্জ বিহারী দাশ
২১৪	অরণ্য চৌধুরী	হরে কৃষ্ণ চৌধুরী
২১৫	রজনী চৌধুরী	দুখী রাম চৌধুরী
২১৬	অশ্বিনী কুমার দত্ত	নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত
২১৭	অর্জুন দে	যাত্রা মোহন দে
২১৮	সতীশ কর	অরবিন্দু কর
২১৯	যুধীষ্ঠির ঘোষ	বেরতী ঘোষ
২২০	সুরেন্দ্র পান্ত	মিলন পান্ত
২২১	সুরেন্দ্র বিজয় পাল	বীরেন্দ্র পাল
২২২	সুধাংশু দত্ত	অরবিন্দু দত্ত
২২৩	রাম মোহন সেন	মিলন সেন
২২৪	কৃষ্ণা চৌধুরী	দীপক চৌধুরী
২২৫	সরস্বতী সেন	মনীন্দ্র সেন
২২৬	স্বতীশ সেন	সুধীর সেন
২২৭	হরিমোহন ঘোষ	বেরতী ঘোষ

২২৮	অর্জুন চৌধুরী	গনন চৌধুরী
২২৯	সুব্রত চৌধুরী	বীরেন্দ্র চৌধুরী
২৩০	নতুন চৌধুরী	মিলন চৌধুরী
২৩১	কুতুবালা চৌধুরী	ত্রেমোহন চৌধুরী
২৩২	মনি বালা ঘোষ	ত্রেমোহন ঘোষ
২৩৩	নিরদা বালা কর	কামিনী কর
২৩৪	মন মোহন বৈদ্য	যোগেন্দ্র লাল বৈদ্য
২৩৫	হরি রাম মজুমদার	বীরেন্দ্র লাল মজুমদার
২৩৬	মল্লিকা দে	রঞ্জন দে
২৩৭	কুসুম বালা কর	মহেন্দ্র লাল কর
২৩৮	হরিমোহন কর	দীপক কর
২৩৯	উপেন্দ্রলাল কর	কামিনী কর
২৪০	যশোদা বালা দত্ত	বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত
২৪১	হীরেন্দ্র লাল সেন	যোগেন্দ্র লাল সেন
২৪২	মনিন্দ্র লাল দত্ত	হরি মোহন দত্ত
২৪৩	নিয়তি লাল কর	অজয় কুমার কর
২৪৪	মনমোহন দাশ	ভগবান চন্দ্র দাশ
২৪৫	মোহিনী সেন	অরবিন্দ সেন
২৪৬	শৈলবালা কর	মন মোহন কর
২৪৭	সূর্য মোহন দত্ত	নতুন কুমার দত্ত
২৪৮	হরি কৃষ্ণ দত্ত	সুরেন্দ্র লাল দত্ত
২৪৯	প্রাণহরি দত্ত	মনীন্দ্র লাল দত্ত

২৫০	দসরত সেন	কামিনী সেন
২৫১	রজনী কুমার দত্ত	প্রাণহরি দত্ত
২৫২	রজনী কুমার দত্ত	বিনোদ বিহারী দত্ত
২৫৩	নতুন চন্দ্র রায়	প্রাণহরি রায়
২৫৪	বনমালী রায়	রাজমোহন রায়
২৫৫	দেবেন্দ্র দাস	

উপরের শহীদদের তালিকাটি *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। একই তালিকাটি নাসিরুদ্দিন চৌধুরী (সম্পাদিত) *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* বইটিতে ও গাজী সালেহ উদ্দিন এর *প্রামাণ্য দলিল মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* বইয়ে রয়েছে। তালিকাটিতে নিম্নের চার শহীদের নাম দু'বার করে এসেছে-

ক্রমিক	শহীদের নাম	পিতার নাম
০১	কামিনী ঘোষ	গোবিন্দ ঘোষ
০২	রায় মোহন চৌধুরী	যাত্রা মোহন চৌধুরী
০৩	অর্জুন দে	যাত্রা মোহন দে
০৪	ক্ষেত্র মোহন নন্দী	রমেশ চন্দ্র নন্দী

অর্থাৎ তালিকাটি মূলত ২৫১ জন শহীদের। নতুন করে ১২ জন শহীদের নাম আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।

ক্রমিক	শহীদের নাম	পিতার নাম
০১	কালী কুমার দত্ত	
০২	কামিনী দত্ত (আশুতোষ দত্তের	

	কাকা)	
০৩	সুনিল চৌধুরী	
০৪	দুলাল চৌধুরী	
০৫	অনিল চৌধুরী	
০৬	কালী কুমার দত্ত	
০৭	হারাধন বৈদ্য	মনীন্দ্র বৈদ্য
০৮	দীপক সেন	সুরেন্দ্র সেন
০৯	মিনতি সেন	
১০	নিকুঞ্জ দাশ	অন্নদাচরণ দাশ
১১	সুরেন্দ্র সেন	
১২	মনীন্দ্র বৈদ্য	

মুজাফরাবাদ এন. জে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক দুলাল কুমার সরকার নতুন দুইজন শহীদের পরিচয় খুঁজে বের করেছেন।

১. পার্শ্বনাথ দত্ত

২. অনীল চক্রবর্তী

মুজাফরাবাদ গ্রামের শহীদদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বহিরাগত রয়েছেন। সম্ভবত আশেপাশের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলো থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল ভেবে অনেকে এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিশেষ করে মুজাফরাবাদ গ্রামের নয় এমন বেশ কয়েকজন নারী শহীদ এখানে রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের ভাষ্য

মুজাফরাবাদ গ্রামের বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীর বর্ণনায় উঠে এসেছে মুজাফরাবাদ গণহত্যার স্মৃতি। তেমন কয়েকজনের স্মৃতিচারণ নিচে তুলে ধরা হল।

সন্তোষ কুমার নন্দী (৫৯), পেশা- চাকুরি, পিতা- প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র নন্দী, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: অগ্রণী ইন্সুরেন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম কার্যালয়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সকাল ৬টা কী সাড়ে ৬টা, আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বাবাসহ ভোরে ওঠে হাতমুখ ধুতে পুকুরে নামছিলাম, আগের রাতে হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ছিল। পূর্বদিকে সূর্য মেঘের আড়ালে পড়ে রশ্মিগুলি রক্তাক্ত রং নিয়ে গাছের পাতাগুলোয় আছড়ায়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন গ্রামটি হঠাৎ কাঁপতে থাকলো বিকট শব্দে। কে কোথায় যাবে, কে কোথায় পালাবে সে কথাটি বলার কারো সম্বিৎ নেই। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমার বাবা, মা বোনেরা বাড়ি ছেলে পালিয়েছে পশ্চিম দিকে, সেই দিকটা নিরাপদ ও আমাদের বাড়ি থেকে কাছে। আমি বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে হুঁশ নেই আমাকে নিয়ে পালাতে, কিন্তু বোনদের নিয়ে ইজ্জতের ভয়ে পিছনের দিকে পালাতে

থাকে। আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না, মনে হয় এই বুঝি গোলা এসে পড়লো। পূর্বদিকে তাকাতেই দেখা গেল দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, পুড়ে যাচ্ছে পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি চিহ্ন। বাতাসে বারুদের গন্ধ। কান্নার রোল, শুধু গুলির শব্দ ও হাহাকার। সামনে ব্রীজ এর কাছে চারজন পাক সেনা বন্দুক নিয়ে জোর পায়ে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তাই দেখে আমি দিই পেছনের দিকে প্রাণপণে দৌড়। আমার বুঝতে বাকী রইল না আমাদের গ্রামের পূর্ব ও মধ্য পাড়ার কী অবস্থা, কেননা আমাদের বাড়ি সর্ব পশ্চিম সীমান্তে। আমাদের পেছনে আরেকটা গ্রাম আসাতা। সেই বিলের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ রক্তাক্ত, কান্নার রোল, প্রাণ বাঁচানোর চিৎকার, কে শোনে কার কথা, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, ঘর বাড়ি পুড়ছে, মনে হচ্ছে সামনে প্রলয়। গুলির শব্দের সাথে কান্নার রোল। পাকবাহিনীর সাথে তাদের দোসর রাজাকার, আল বদরেরা লুট করছে টাকা, সোনা, রুপা থেকে পাতিল, কাঠ, ফার্নিচার, ঘরের দরজা, জানালা, কাঁঠাল, সুপারী, পুকুরের মাছ থেকে আরম্ভ করে দা বটি পর্যন্ত। রাস্তায় রাস্তায় মা বোনদের সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করছে পাক বাহিনী। মরিচ বাটার পাটা থেকে ঝাড়ু পর্যন্ত লুটে নেওয়া থেকে বাকী রইলো না, ইতিহাসের জঘন্য সাক্ষী নর পিশাচারেরা কিভাবে এত নীচ হতে পারে তা দু'চোখে না দেখলে কল্পনা করা দুষ্কর। সকালে ৬টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাক হানাদার বাহিনী গ্রামের যুবক ছাত্র এমনকি আশি বছরের বৃদ্ধকেও তাদের বুলেট এবং বেয়নেটের খোঁচা থেকে রেহাই দেয়নি। বিকাল ৪টার দিকে পাক হানাদার বাহিনী চলে গেল গ্রাম ছেড়ে, রেখে গেছে একটি পোড়া শশ্মান। যেখানে লাশ নিয়ে কুকুর শেয়াল টানাটানি করছে। ভেবেছিলাম পাক হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার পর একটু স্বস্তি আসবে। কিন্তু না, শত শত লুটেরা এসে গ্রামের পোড়া মাটিতে যে টুকু সম্বল ছিলো তাও লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। কারণ কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই। সে হিন্দু হোক, আর আওয়ামী লীগ সমর্থক মুসলিম হোক। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমাদের গ্রামে কিছু সংখ্যক সমাজসেবী যুবক পার্শ্ববর্তী মুসলিম বন্ধুদের নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। অতি সাহসের সাথে তারা উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে। তখন তাদের সাথে উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম খরনা, শোভনদন্ডী, আসাতা, রশিদাবাদ, কাঞ্চনাবাদ, আজিমপুর গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

তিন শতাধিক শহীদের স্মৃতিতে ১৯৭২ সালে নির্মিত শহীদ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩ মে সেই ভয়াল রাত। পোড়া ঘরের আগুনে লাল হয়ে আছে গাছপালা, রাতেও জ্বলছে আগুন, লাশের পর লাশ। বাবা ছেলেকে একসাথে দড়ি বেঁধে বেয়নেট দিয়ে

হত্যা করেছে। মা বাবাকে বেঁধে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে তাদের সামনে। পালাক্রমে ধর্ষণ করে পরে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করেছে বহু নারীকে। বাতাসে লাশের গন্ধ। শৃগাল লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রাতে আরো অনেক সাহসী যুবক ফিরে এসেছে। আহতদের আর্তচিৎকারে, স্বামীহারা স্ত্রীর কান্নায়, সন্তানহারা মায়ের কান্না, চারদিকে যেন ভয়ার্ত পরিবেশ। আহতদের চিকিৎসার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী টিম তৈরী করা হয়। শুধুমাত্র একটি জায়গায় ১০০ এর বেশি লাশ যাদের বেয়নেট ও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বেশিরভাগ লাশ পুকুরে অথবা রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হয়েছে। ঘরে আগুন দিয়ে আগুনের মধ্যে জীবন্ত পুড়ে মেরেছে প্রায় ৫০ জনের অধিক। আমরা স্মরণ করছি সেই ইতিহাসের নির্মম বর্বর জঘন্যতম দিন ৩ মে কে। একটি মাত্র গ্রাম থেকে হানাদারেরা ৩ শতাধিক নারী-শিশু পুরুষকে হত্যা করেছে। আহত করেছে ৪ শতাধিক নারী পুরুষকে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে প্রায় ৬ শতাধিক, লুট করেছে প্রায় অবশিষ্ট ২০০ পরিবারের সবকিছু। গ্রামের ৮০০ পরিবারের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অক্ষত আছে। একটি রাত ছাউনির নিচে মাথা গুজে থাকতে পারবে, দুমুঠো ভাত খেতে পারবে এই ক্ষমতা নেই কারও। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারি, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে রয়েছে আমাদের ৩০০ শহীদের রক্ত। আমাদের আছে মুক্তিযোদ্ধা, যারা ৯ মাস দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায়। ৩ মে কে মুজাফরাবাদ গণহত্যা দিবস হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার দিনটি পালন করছে। সরকারী অর্থে নির্মিত হয়েছে ৩ শত শহীদের স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদ স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মধ্যস্থানে শহীদ মিনার। গণতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির নিকট আহবান জানায় যারা ৩ মে লুটের সাথে এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা এখনো জীবিত আছে। দেশে এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে। আমরা আজ সেই নরঘাতক, ধর্ষক, লুটেরাদের বিচার চাই, যারা মানবতার বিরোধী জঘন্য অপরাধ করে এখনো সদর্পে বেঁচে আছে। যদি বর্তমান সরকার তা করতে পারে তবেই ৩ মে নিহত ৩০০ শহীদের বিদেহী আত্মাগুলো শান্তি পাবে। শান্তি পাবে সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের স্বজনেরা।

হরিমোহন কর (৮৪), পেশা- চাকুরি(অব.), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ১২ নভেম্বর ২০১৪

১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। ফটিকছড়িতে পাবলিক হেলথ অফিসার হিসেবে চাকুরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে চলে আসেন গ্রামে। ৩ মে তিনি বড় ভাই সত্যানন্দন করকে হারান। ৫০ বছর বয়সী সত্যানন্দন কর পটিয়াতে বেকারিতে চাকুরি করতেন। মেয়ে শোভা রাণী কর পাকবাহিনীর লালসার শিকার হয়েছিলেন এই দিন। গ্রাম আক্রান্ত হলে তিনি পাশের পুকুর পাড়ে লুকিয়ে জীবন রক্ষা করেছেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী ৩টি ট্রাকে প্রায় ৩০০ পাক সেনা মুজাফরাবাদ অভিযানে অংশ নেয়। বিকালে হানাদার বাহিনীর বিদায়ের পর পুকুর পাড় থেকে বের হয়ে আত্মীয় পরিজনদের সৎকারের ব্যবস্থা করেন।

‘গর্ত করে প্রতি গর্তে ৮-১০ জন করে কবর দেয়া হয়। পাক বাহিনী যাওয়ার পর রাজাকাররা ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে। গরু-বাছুর, নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার এমনকি রান্নার হাড়ি-পাতিল পর্যন্ত নিয়ে গেছে তারা’।

সুনীল সেন (৭৫), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ১২ নভেম্বর ২০১৪

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন: তপন পালিত, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সেদিন সকালে পাক সেনাবাহিনীর আক্রমণে গ্রামের নারী পুরুষ ও শিশু অনেক মানুষ নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন। তার মধ্যে একটি আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা, নির্মল সেন ও তার পিতা উপেন্দ্র সেনের হত্যাকাণ্ড। পৈশাচিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয় তাদের। ঐ দিনে যখন গ্রাম আক্রমণ করা হয়, তখন নির্মল সেন বাড়ির পাশে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল। হঠাৎ পাশ্ববর্তী বাড়ি থেকে নির্যাতিত নারীর আর্তচিৎকার ভেসে আসে। সেই নারীর আর্তনাদ সহ্য করতে না পেরে নির্মল সেন এগিয়ে যান। দেখেন উঠানে এক হানাদার পাহারা দিচ্ছে। নির্মল সেন এ ঘটনা দেখে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় ঐ সেনা সদস্যকে শক্তভাবে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করল। পরমুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে দুইজন পাক সেনা এসে নির্মল সেনকে আক্রমণ করল এবং হাত-পা বেঁধে গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। তখন সেই জোরে বাবা বাবা বলে চিৎকার করতে থাকে। বাবা আমাকে মিলিটারী বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি এসে বললে আমাকে ছেড়ে দেবে। তখন তার বাবা ছেলের শব্দশুনে উর্ধগতিতে ছুটে এসে পাকবাহিনীর দুই পায়ে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু পাকবাহিনীর মন তাতে একটুও গলেনি। মধ্য পাড়ার উত্তর দিকে বিলের মধ্যে পিতা পুত্র দুইজনকে গুলি করে মর্মান্তিক ভাবে হত্যা করা হয়। পুত্রের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবনও বিসর্জন দিলেন উপেন্দ্র সেন।

হারাধন ঘোষ রায় (৬৩), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

১৯৭১ সালে হারাধন ঘোষ কানুনগো পাড়া কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চলে আসেন গ্রামে। রাত জেগে গ্রামের তরুণদের সাথে শুরু করেন পাহারা দেয়া। ৩ মে অন্য অনেকের মতো তিনিও বেঁচে গিয়েছিল পালিয়ে। তাঁর মতে, মুজাফরাবাদের স্থানীয় লোকের পাশাপাশি সেদিন পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের হিন্দু সম্পদায়ের লোকেরা বিশেষত নারীরা এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। পাক বাহিনী এদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়।

৩ মের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সেদিন ছিল সোমবার। সকাল ৬.০০টার সময় পাক বাহিনী গ্রামের তিনটি প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করে ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু করে। পাকবাহিনীর সাথে এই পৈশাচিক হামলায় খরনা ইউনিয়নের জন

পঞ্চাশেক রাজাকার অংশগ্রহণ করে। পাক বাহিনী ম্যাপ নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করে। আর ঢুকেই তারা শেলিং শুরু করে দেয়। ঘুমন্ত গ্রামবাসী দৌড়ে পালাতে শুরু করে। এরপর তিনি কিভাবে বিভিন্ন লোকজনকে হত্যা করা হয়েছে সে বর্ননা তুলে ধরেন। মুজাফরাবাদ গ্রাম আক্রমণের পেছনে তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা রমিজ আহমদের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেন। এই গ্রামের উপর তাঁর আক্রোশের কথা বলেন। বিশেষ করে এন, জে স্কুলের নাম পরিবর্তন করে সেখানে এন, জে, আর স্কুল করে নিজের নাম তিনি সংযুক্ত করতে চান। যেটার ফলে এলাকার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মূলত মুজাফরাবাদ গ্রামের এই তরুণ সম্প্রদায়ের চাপে তার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়নি। এরপর খরনার মাল্টিপারপাস ব্যাংক নিয়ে তিনি মামলায় হেরে গেলে মুজাফরাবাদ গ্রামের লোকজনদের উপর তার ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে। সেই ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ ঘটেছিল ৩ মে মুজাফারবাদ আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

গৌরাঙ্গ পদ ঘোষ (৭২), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছর। সাতবাড়িয়া বহরমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিলের শুরুতে গ্রামে চলে আসেন গৌরাঙ্গ। ৩ মে মুজাফরাবাদ গণহত্যার দিন নিজ বাড়িতেই ছিলেন তিনি। ভয়ে পালিয়ে যান পার্শ্ববর্তী পুকুর পাড়ে। প্রায় সারাদিনই লুকিয়েছিলেন ঝোঁপের আড়ালে। তাঁর বাবা কামিনী কুমার ঘোষকে গুলি করে পাক বাহিনী। যদিও পরে তিনি আলৌকিক ভাবে বেঁচে যান। ১৯৯৫ সালে যুদ্ধাহত এই মুক্তিযোদ্ধা মারা যান। গৌরাঙ্গ থেকে জানতে চেয়েছিলাম পাকবাহিনীর আক্রমণের কারণ কি?

তাঁর সহজ উত্তর, 'খরনার মুসলিম লীগ নেতার প্ররোচনায় পাক বাহিনী এই গ্রাম আক্রমণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিবাহিনীর আস্তানা খ্যাত মুজাফরাবাদ ধ্বংস করা'।

৩ মে মোট কতজন শহীদ হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'সংখ্যাটি ৩৫০ এর কাছাকাছি'। স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা রমিজ মিয়া মিটিং এর কথা বলে এলাকার সকল লোককে একসাথে জড়ো করেছেন সেটা বর্ণনা করেন গৌরাঙ্গ। নারীদের উপর কিভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, তার বিবরণ উঠে এসেছে তাঁর বর্ণনায়। পাকবাহিনীর নৃশংসতার বর্ণনার পাশাপাশি পরবর্তীতে রাজাকারদের লুটপাটের নানা ঘটনার তিনি স্মৃতিচারণ করেন।

দুলাল কুমার সরকার (৭২), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

পটিয়া উপজেলা শহরের ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে কক্সবাজার মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী মুজাফরাবাদ প্রায় ৫ হাজার হিন্দু অধ্যুষিত একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। সেইদিন খুব

ভোরে পাক সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা অতর্কিতে গ্রামটির তিনদিক থেকে ঘিরে প্রায় তিনশত নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। ধর্ষণ আর নির্যাতন করেছে গ্রামের মা-বোনদের।

সেদিন ছিল সোমবার। ৩ মে, ১৯৭১ সাল। আমরা যারা শহরে থাকতাম সবাই তখন আশ্রয় নিয়েছিলাম গ্রামে। নিরাপত্তার জন্যে জীবন বাঁচাতে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতাম। তখন কি জানতাম শহর ছেড়ে গ্রামের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে যুদ্ধের দাবানল? কেন এই গণহত্যা? শান্তি প্রিয় নিরীহ কিছু লোক মনের আনন্দে দিন কাটাতো ছায়া সুনিবিড় এই গ্রামে। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা হিন্দু। একাত্তরে বাংলাদেশে হিন্দু নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, কারণ পাক সেনাদের বোঝানো হয়েছিল হিন্দুরা পাকিস্তানের বড় শত্রু। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতের দালাল। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একচেটিয়া জিতে ছিল হিন্দুদের কারণে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ধ্বংস করতে পারলে আওয়ামী লীগ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই যেখানে হিন্দু আছে সেখানেই আক্রমণ। যেখানে যাকে পাওয়া যায় পাক বাহিনী প্রশ্ন করে 'তোম হিন্দু হ্যায়' উপরওয়ালার নির্দেশ ছিল, 'মালোয়ানকো খতম করো, ডান্ডিকো মার ঢালো'।

পটিয়া পতনের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি বহর যখন মুজাফরাবাদের পাশে আরাকান রোড দিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাস্তার পাশে যাকে যেখানে দেখেছে তাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কিন্তু মিলিটারী গাড়িবহর রৌশনহাট পৌছার পর জানি না তাদের কী হলো! রৌশনহাট থেকে শেলিং শুরু হলো মুজাফরাবাদ গ্রামের উপর। প্রতিদিনের মতো আমরা ক'জন আড্ডা ভেঙ্গে মিলন ঘোষদের বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে বসে গাড়ির বহর দেখছিলাম। শেলিং এর সময় আমরা যে যেদিকে পারি পালাচ্ছিলাম রাস্তার ধারে এবং ঝোপের আড়ালে। সেদিনের শেলিং এ দক্ষিণ পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা গোলার স্প্রিন্টারের আঘাতে আহত হয়েছিল। সেদিন শেলিং এর উদ্দেশ্য ছিল, গ্রাম থেকে কোন গুলি-গোলার সাড়া পাওয়া যায় কিনা। কারণ ঐ পাক সেনাদের ধারণা দেওয়া হয়েছিল মুজাফরাবাদ গ্রামে সবাই হিন্দু, সবাই আওয়ামী লীগ সমর্থক। এখানে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক জোয়ান লুকিয়ে আছে এবং গ্রামের যুবকদের ট্রেনিং দিচ্ছে। প্রচুর অস্ত্র আছে এই গ্রামে। এ খবর পাক সেনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। পরে তারা দোহাজারী গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল।

৩ মে পাক-বাহিনীর সৈন্যরা গ্রামের যেখানে যাকে পেয়েছে গুলি করে হত্যা করেছে। নিরীহ অসহায় গ্রামবাসীর উপর এমন লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড পূর্বে কোথাও ঘটেছে বলে শুনা যায়নি। প্রতিদিন সকালে মধ্যপাড়ার সংসার ত্যাগী নবীন সাধু গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গীতা পাঠ করে সংসারী মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতো। রঙিন কাপড় পড়া বয়োবৃদ্ধ এই সাধুকে মিলিটারীরা ধরে বললো, " বলো জয় বাংলা"। সরল বিশ্বাসী সাধু তাই করলেন। পাক বাহিনী তাঁর মুখের ভিতর বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দিল। তারপর আওয়াজ হলো গুড়ুম। এইভাবে মুখের ভিতর বন্দুকের নল ঢুকিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে পূর্ব পাড়ার বয়োবৃদ্ধ রজনী সেনকে। মধ্য পাড়ায় ধরা পড়লো নির্মল সেন ও তার বাবা উপেন্দ্র সেন, ক্ষেত্রমোহন মজুমদার, অন্নচরণ বৈদ্য, ক্ষেমেশ চৌধুরী, সত্য রঞ্জন কর, রায় মোহন চৌধুরী প্রমুখ। তাঁদের ধরে অমানুষিক নির্যাতন করেছে। তারপর যাকে যেখানে খুশী কুকুর-শৃগালের মতো গুলি করে হত্যা করেছে। প্যারী মোহন দাশের বাড়িতে ঘরের টিন জ্বলে জ্বলে লাল হয়ে গেছে। ক্ষেত্র মোহনকে সেই জ্বলন্ত টিনের উপর নিক্ষেপ করেছে। পরে তাকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছে। আরো কয়েকজনের আধাপোড়া গুলিবিদ্ধ লাশ মধ্যপাড়া শ্যামাচরণ মহাজনের বাড়িতে পড়েছিল। এছাড়া রাস্তার ধারে, খালের ধারে, পুকুর পাড়ে যেখানে সেখানে আরো কত শত শহীদের বিকৃত লাশ পড়ে ছিল তা' কি লিখে শেষ করা যাবে?

নির্মল সেন ও তার বাবা লুকিয়েছিল বাড়ির পাশে ঝোপের ভিতর। আবার বাড়ির কেউ কেউ লুকিয়েছিল অন্ধকার ঘরের খাটের নীচে। ভোর বেলা হঠাৎ করে মিলিটারী

এসে পড়াতে তারা কেউ দূরে পালাতে পারেনি। মিলিটারীদের সাথে যেসব গুন্ডা-পান্ডারা ছিল, তারাই নির্মলকে খুঁজে বের করেছে। তাকে ধরে নিয়ে যাবার সময় তাঁর বাবা কেঁদে কেঁদে বললো, 'বাবা তোমরা আমাকে মেরে ফেলো, আমার ছেলেটাকে মেরো না'। তার বাবা মিলিটারীর পা জড়ায়ে ধরে কাঁদছিল। কিন্তু বুটের লাথি আর সঙ্গিনের খোঁচা ছিল সকল শহীদের প্রথম পাওনা। তারপর স্ত্রী পুত্রের সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করা হলো। নির্মল সেনের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে উত্তর বিলে। গুলি করার আগে তাকে অমানুষিক নির্যাতন করেছে। এসব কথা মনে পড়লে আজও ভয়ে শরীর শিউরে ওঠে।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রায়মোহন বিশ্বাস সেদিন সকালে বাড়ির সামনের পুকুরে মাছ ধরছিলেন। গ্রামের সেই জনপ্রিয় শিক্ষক আর অভিনেতাকে পুকুরেই গুলি করে হত্যা করেছে। এরপর হত্যা করেছে একই বাড়ির মানিক চৌধুরীকে। শংকর সেন গ্রামের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় সমাজকর্মী। তিনি পালিয়ে ছিলেন, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা পালাতে পারেনি। তাদের আনতে গিয়ে ধরা পড়লো মিলিটারীর হাতে। নির্মমভাবে হত্যা করা হলো তাকে। দত্ত পাড়ার বীরেন্দ্র দত্ত, কামিনী দত্ত, সারদা সেন ও কালী কুমার দত্ত সহ আরো কয়েকজনের লাশ পড়েছিল দত্ত পাড়ার দক্ষিণে বুড়ি পুকুরের পাড়ে। দক্ষিণ পাড়ার নিরঞ্জন বিশ্বাস লুকিয়ে ছিলেন খাটের নীচে। কিন্তু চোখের সামনে নিজের মেয়েকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি বের হয়ে মিলিটারীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। নির্মম পশুর দল তাকে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করেছে। পূর্ব পাড়ার রুহিনী চৌধুরী শাড়ী পরে খাটের নীচে লুকিয়েছিল। ধরা পড়লো মিলিটারীর হাতে। সেই দুঃসাহসী রুহিনী মিলিটারির রাইফেল কেড়ে নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে অন্য মিলিটারিরা এসে তাকে গুলি করে হত্যা করে। পশ্চিম পাড়া থেকে সুরবালা নামে এক বিধবা তার ১৫/১৬ বছরের প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে পূর্ব পাড়া আসার পথে দুজনকেই গুলি করে হত্যা করে। মৃত মায়ের বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল ছেলের তরতাজা লাশ। মধ্যপাড়ার সুরেন্দ্র সেন তার ছেলেকে কোলে নিয়ে পালাচ্ছিল। পিতা পুত্র দুজনকেই গুলি করে হত্যা করলো নরপশুর দল। সেদিন যারা নিহত হয়েছে তাদের অনেকের নাম আজ ভুলে গেছি। পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে পড়েছিল গুলিবিদ্ধ লাশ। কোনটা বিকৃত, কোনটা অবিকৃত। উত্তর পাড়ার বনমালী দাশ, অশ্বিনী দাস ও নিকুঞ্জ দাস সহ ৫/৬ জনকে পুকুর পাড়ে লাইন করে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করেছে।

মহুরী বাড়ির নিরঞ্জন চৌধুরী পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়লো আমার শ্বশুর স্বর্গীয় নিকুঞ্জ মাষ্টারের বাড়িতে, যেখানে বর্তমানে লোকনাথ মন্দির ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে খুব কাছে থেকে সামনা সামনি গুলি করেছে। কিন্তু রাখে হরি মারে কে? গুলি তার বুকের দিকে ঢুকে পিঠের দিকে বেরিয়ে গেছে। রক্ত গঙ্গায় ডুবে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন, 'আমি মারা যাচ্ছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে; তাই অতিকষ্টে পশ্চিম থেকে উত্তর শিয়র হয়ে মরার মতো পড়ে থাকলাম। এর মধ্যে কয়েকবার মিলিটারী এসেছে এবং মৃত ভেবে আমাকে পা দিয়ে উল্টিয়ে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর বকা পিসিকে দেখতে পেলাম'। বকা পিসি মানে আমার শ্বাশুড়ী স্বর্গীয়া সৌদামিনী বিশ্বাস। তিনি ভেবেছেন নিরঞ্জন মারা গেছে। 'তখন আমি জল জল করে কাতরাচ্ছি'। বকা পিসি কাছে আসলে বললাম, 'পিসি আমি মরিনি। আমাকে একটু জল দাও'। বকা পিসি হন্ত দন্ত হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে পুকুরে নেমে তাঁর আঁচল ভিজিয়ে পানি এনে আমার মুখে দিল। তারপর লোকজন এসে আমাকে পশ্চিম পাড়া আমার বোনের বাড়িতে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর ডাঃ দেশবন্ধু এসে আমার ক্ষতের ভিতর বালিশের তুলা ঢুকিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের পর ভারত থেকে ৪ জন স্বনামধন্য সাংবাদিক অনিল সেন, দীনেশ দাশগুপ্ত, ভূপেন রায় ও *হিন্দুস্তান টাইম্‌স* এর সম্পাদক এসেছিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত মুজাফরাবাদ গ্রাম পরিদর্শন করার জন্যে। তাদের সারা গ্রাম ঘুরে দেখালাম। তখন

গ্রামের পোড়া বাড়িগুলো বর্ষার জলে ভিজে ভিজে মাটির সাথে মিশে গেছে। ঘরের ভিটায় উঠেছে সবুজ ঘাস। তা দেখে অনিল সেন বললেন, "এখানে এমনভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে যা দেখে মনে হয় কোন কালেও এ গ্রামে ঘরবাড়ি ছিল না, নয়মাসে কীভাবে এমন এক জনপদ মরুভূমিতে পরিণত হল? তখনও হাই স্কুলে শরণার্থী ছিল। ডাঃ বিনোদ বাবুর করুণ কাহিনী শুনে, তাঁর ছেলে বারেন রায়ের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কথা জেনে *হিন্দুস্তান টাইম্‌স* এর সম্পাদক তাঁকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদেই দিলেন। আমি বললাম, এটাই শেষ নয়, তার বড় ছেলে শহীদ বিভূতি রায় চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গে ৬০ এর খাদ্য আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন। এসব কথা শুনে শ্রদ্ধায় তাঁদের মাথা নত হয়ে গেল। মুজাফরাবাদ গ্রামের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে দীনেশ দাশ গুপ্ত এবং ভূপেন রায় বললেন, 'জাঁদরেল পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের বীরত্ব দেখালো গ্রামের কতগুলো নিরীহ লোক হত্যা করে'! অমৃত *বাজার পত্রিকার* সম্পাদক অনিল সেন বললেন, 'আপনাদের করুণ কাহিনী শুনে আমরা মর্মাহত। আমরা ভারতে গিয়ে আপনাদের এই মর্মান্তিক কাহিনী আমাদের পত্র-পত্রিকায় লিখবো'।

কিছুদিন পর সুইজারল্যান্ড থেকে ৬ জনের একটি দল এসেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পরিদর্শন করতে। তাদের মধ্যে জুরিখ ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপিকা সুওয়ার্জকে চট্টগ্রামের আক্রান্ত কয়েকটা গ্রাম দেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর। যেদিন উনাকে নিয়ে গ্রামে আসলাম, সেদিন হেমন্ত চৌধুরীকে বোমা মেরে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা সেখানে থাকা অবস্থায় এলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী। সুওয়ার্জ অবাক হয়ে বললেন, বাংলাদেশে যুদ্ধ কী এখনো চলছে? সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম তার এক বইতে লিখেছেন, 'পটিয়ার মুজাফরাবাদ গ্রামে গেলে বোঝা যায় গণহত্যা কাকে বলে। সেখানে পাক সেনারা পাখির মত গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে'।

৭১ এর ৩ মে'র মৃত্যুর মিছিলে আরও কত প্রাণ যে হারিয়ে গেছে তার কি হিসেব আছে? মধ্যপাড়া হুতুম পুকুরের পাড়ে গণকবর দেওয়া হয়েছে শত শত শহীদকে। গভীর রাতে এক শ্মশানে অনেকগুলো শব একসাথে দাহ করা হয়েছে।

[লেখাটি সংকলিত হয়েছে *উত্তাল*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা, ২০১০ থেকে]

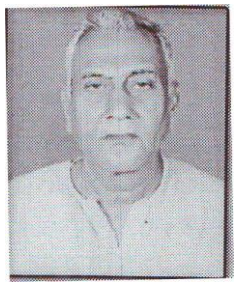

বিধান রায় চৌধুরী, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম (প্রাক্তন সভাপতি, খরনা ইউপি আওয়ামী লীগ)

১৯৭১ ৩ মে সোমবার সকাল তখন পৌনে পাঁচটা, একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে। পাক বাহিনী আর না আসতে পারে আজ এমন ও ধারণা হয়েছিল কারো মনে মনে। এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল আমাদের গ্রামের উত্তরপাড়া আশ্রমটিতে আগুন। শুনলাম পাক বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করেছে। তারা গ্রামে ত্রিমুখি আক্রমণ করল। গুলির আওয়াজ শুরু হল তখন মেয়ে লোকেরা চিৎকার করে বললো পাঞ্জাবী সৈন্য এসে গেছে তোরা সবাই পালা, তখন আমরা কে কোন দিক গেছি তা বলতে পারি না। আমি এবং ধনা ঘোষ দুইজনে পালিয়ে চলে গেছি এবং মা কোথায়, বাবা কোথায়, বোন কোথায় এই সব বলে কান্না করছি। সেই খান থেকে শুধু শুনতে পাচ্ছি গুলির আওয়াজ। আগুনের নীলশিখা আর চিৎকার। সারাদিন অর্থাৎ বিকাল ৫ টা পর্যন্ত সেইদিন পাকবাহিনী,

রাজাকার, আলবদর (পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে) আর বিহারী বাহিনীর অত্যাচারে গ্রামবাসীকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অত্যাচার কাকে বলে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রমাণ করে দিয়েছে পাক বাহিনী সেই দিন। বিকাল ৫ টার পর সেখান থেকে রওনা হই। ৬টায় গ্রামে প্রবেশ করি। তখন দেখি রাস্তার পাশে শুধু লাশ আর লাশ। মা, বাবা, ভাই, বোন কারো সঙ্গে দেখা হয় নাই। এই অবস্থায় আমরা পশ্চিম পাড়া বিনোদ বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেই। এই সব ভয়ানক দৃশ্য এই প্রথম যারা চোখে দেখেছে তারাই বলতে পারবে এবং তাদের হৃদয়ে এই ভয়ানক দৃশ্য পুঞ্জিভূত হয়ে থাকবে। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এই ভয়ানক দৃশ্য ভুলতে পারব না। আমরা পশ্চিম পাড়া বিনোদ বাড়ির রশিদাবাদ সফি ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। মোট কথা রশিদাবাদ, শোভনদণ্ডীর গ্রামবাসী আমাদের অনেক উপকার করেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তারপর ভারতে চলে যাই, নয় মাস পরে এসে মুজাফরাবাদ হাই স্কুলে রিলিফ ক্যাম্প গঠন করি।

[লেখাটি *উত্তাল*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা, ২০১০ থেকে সংকলিত]

মিলন কান্তি চৌধুরী, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু, 'এ বারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এ বারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উচ্চারণ করে বাঙ্গালিদের যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন মুজাফরাবাদ গ্রামের মুক্তি পাগল জনসাধারণ প্রস্তুতি নিতে থাকে নেতার পরবর্তী নির্দেশের জন্য। অবশেষে ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাতে স্বাধীনতাকামী অন্যান্য দেশবাসীর মত মুজাফরাবাদ গ্রামের সর্বস্তরের জনগণও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। চলছে সংগ্রাম, চলছে প্রস্তুতি। মুজাফরাবাদ গ্রামবাসী ছিল আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যায়ী। মুক্তি পাগল গ্রামবাসী কখনও ভাবেনি যে, এক কাতারে দাঁড়িয়ে যারা জয় বাংলা শ্লোগানের মাধ্যমে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছিল, নৌকা মার্কায় শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করেছিল তাদের মধ্যে কোন কোন বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে হিন্দুদের বাড়ি ঘর লুট করে তাদের হত্যা করার জন্য পাকিস্তানী গুন্ডা বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে গ্রামে।

২৬ মার্চ হতে ২ মে পর্যন্ত সময়ে গ্রামে লুটপাট ও বাড়ি ঘরে আগুন দিতে স্থানীয় কিছু ভদ্রবেশী গুন্ডা বহুবার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সম্ভব হয়নি। তাদের এই অশুভ তৎপরতাকে বিনাশ করে দিয়েছিল গ্রামের লোকজন। গ্রামের চারদিক সীমান্তে বিশটি ক্যাম্প করে প্রতিটি ক্যাম্পে বিশজনের অধিক লোক গ্রাম পাহারা দিত। প্রতিরাতে গ্রামের মধ্যখানে ছিল পঞ্চাশজনের একটি অস্ত্র সজ্জিত শক্তিশালী দল। তাছাড়া বিশটি ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অস্ত্রের সাথে ছিল ২০ টি কাঁসা। নির্দেশ ছিল গ্রামের যে কোন অংশ আক্রমণ হয় তবে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের কাঁসা বাজাতে হবে। সাথে সাথে এ বিশটি ক্যাম্পের বিশটি কাঁসাই এক সাথে বেজে উঠবে। ফলে সকল গ্রামবাসী জেগে উঠে অস্ত্র সজ্জিত দলসহ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রামের আক্রান্ত স্থানে পৌছে যাবে। পরিকল্পনামত বেশ কয়েকবার এ অপশক্তির হীন তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছিল এভাবে। তাই, স্বাভাবিক কারণে স্থানীয় কিছু গুন্ডাদল তৎকালীন খরনা ইউনিয়নের প্রভাবশালী মুসলিম

লীগ নেতার প্ররোচনায় গ্রামের উপর যে কোন অপকর্ম চালানোর সুযোগ খুঁজতে থাকে। গ্রামের একতা এবং ঐক্যশক্তির কথা ইতিপূর্বে আক্রান্ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে প্রচারিত ছিল। তাই প্রাণ বাঁচাতে বহু হিন্দু পরিবার মুজাফরাবাদ গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়। চলতে থাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি। ক্যাপ্টেন করিমসহ বেশ কিছু ই.পি.আর সৈন্য পটিয়াতে আশ্রয় নিলে গ্রামের যুবশক্তি তাদের জন্য খাবার সংগ্রহ করে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে পটিয়া কলেজে তাদের দিয়ে আসে। পাকিস্তানী বাহিনী যখন চট্টগ্রাম শহর দখল করে নিয়ে পটিয়া এবং দোহাজারীতে ঘাঁটি করে তখন পর্যন্ত গ্রামের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ এবং আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার প্রস্তুতি চলছিল। তাছাড়া গ্রামের লোকেরা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রচারণাকে বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধুর সকল নির্দেশ পালন করে চলছে একের পর এক। ইতিমধ্যে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিগণ গোপনে পটিয়া ও দোহাজারী ক্যাম্পের পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সাথে যোগাযোগ কারে তাদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে, 'মুজাফরাবাদ গ্রামের সকল নরনারী মুক্তিযোদ্ধা তারা সবাই হিন্দু এবং ভারতের দালাল'।

২ মে সারারাত গ্রাম পাহারা দিয়ে ক্লান্ত গ্রামবাসী ভোরবেলা ঘরে ফিরে আসে একটু বিশ্রাম নিতে। কেউ কেউ শুয়েছেন বা কেউ কেউ নিজ নিজ কাজে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঠিক এমনি সময়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায় গ্রামের তিনদিক থেকে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পূর্বদিক হতে পশ্চিম দিক অগ্রসর হতে থাকে তিন প্লাটুন বর্বর হানাদার পাকিস্তান বাহিনী। সাথে ছিল সাদা পোশাকে অর্থাৎ পায়জামা পাঞ্জাবী ও টুপি পরিহিত অবস্থায় সশস্ত্র লোক। মনে হল এ লোকগুলি নব্যরাজাকার যারা নির্বিচারে ঐ দিন অসহায় গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে। তাদের সাথে ছিল কিছু স্থানীয় মুখচেনা দালাল। যারা গ্রামের পথ নির্দেশনা কাজের সাথে সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে হত্যা করার কাজে সহযোগিতা করেছিল এবং মনের আনন্দে লুটপাট চালিয়েছিল। গ্রামের প্রবেশ পথে মেশিনগান বসানো ছিল। তারপর তিনটি জিপে চড়ে রাজাকার এবং পাক হানাদারেরা মেশিন গানের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারা পাখির মত লোক হত্যা করল এবং গান পাউডার দিয়ে সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অসহায় গ্রামবাসীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে হানাদার বাহিনী লুটেরাদের লুট করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। গ্রামের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে যারা পালাতে চেষ্টা করেছে তারা সকলেই প্রাণ দিয়েছেন নরপশুদের গুলিতে। যখন একদিকে জ্বলছে গ্রাম, প্রাণ দিচ্ছে অসংখ্য সাধারণ মানুষ, ধর্ষিতা হচ্ছে নারী, মানুষের হাহাকার আর বুকফাটা ক্রন্দন, গুলির কানফাটা শব্দে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, তখন এহেন বিভাষিকাময় ক্ষণে নরপশুদের উল্লাস এবং নারী সম্ভোগ যেন সৃষ্টিকর্তার অন্তরকে বেদনাময় করে তুলেছে। সকাল ৫টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত চলে এ হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন। ইতিমধ্যে প্রায় তিন শতাদিক নারী পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং গ্রামের প্রায় সকল বাড়িঘর পুড়ে ছাই করে দিয়েছে হানাদারেরা।

৩ মে দিনটির পরও সমান তালে চলছিল স্থানীয় লুটেরাদের তান্ডবলীলা, পরবর্তী দিনগুলিতেও চলে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ। লুটার ও রাজাকারদের ভয়ে গ্রামবাসী সবসময় ছিল ভয়ে আতংকগ্রস্ত। অবশেষে অসহায় গ্রামবাসী তাদের প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পায়ে হেঁটে ধোপাছড়ি দিয়ে রামগড় হয়ে আইজল অর্থাৎ ভারতের আসাম রাজ্যের শরণার্থী হয় এই মুজাফরাবাদ গ্রামবাসী। পথে পথে কত নারী পুরুষ যে প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব নেই।

[লেখাটি *উত্তাল*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা ২০১০ থেকে সংকলিত]

সুমন সেন (৫১), পিতা- শহীদ শংকর প্রসাদ সেন, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম

মানুষের জীবনে এমন কিছু স্মৃতি থাকে যা চাইলেও মানুষ ভুলতে পারে না। বাবাকে নিয়ে আমার স্মৃতিকথাটা ঠিক ঐ রকমই। চার ভাই এক বোনের মধ্যে আমিই সবার ছোট এবং মা-বাবার খুবই আদরের। পাঁচ বছর বয়সে আমার স্মৃতিপটে এতটুকু মনে থাকার কথা নয়। এখানে আমার সাথে আমার গর্বিত সংগ্রামী মার বাস্তবামুখী অভিজ্ঞতাকে সংযোজন করে এই কথাগুলো লেখার সাহস পেয়েছি। স্বাধীনতার এত বছর পর হৃদয় বিদারক করুণ স্মৃতিগুলো অনেকটা বিস্মৃতির পথে। তবুও প্রাণখুলে মনের আবেগ মাখা হৃদয়বিদারক, পিতৃহারা স্মৃতিটুকু আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ১৯৭১ সালের ২ মে পটিয়া থানা হেড কোয়ার্টারে শত শত বোমা বিস্ফোরিত হয়। আমাদের পৈতৃক একটি কাপড়ের দোকান ছিল (পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং এর সামনে)। বাবা সেটা পরিচালনা করতেন, সেই কারণে সেদিন দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে এসে শুরু হয়ে যায় দৌঁড়াদৌঁড়ি। সবার মুখে মুখে পাঞ্জাবী আসছে, পাঞ্জাবী আসছে। তখন মানুষ অসহায় ও নিরূপায় হয়ে শুধু গ্রামের পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে রওনা হতে শুরু করল। অন্যান্যদের মত বাবাও মাকে বললেন, চল আমরাও নিরাপদ কোন স্থানে চলে যাই। যেতেই মিনিট দশেক পরে বাবা যেন হাঁপিয়ে উঠলেন, বললেন আমি হাঁটতে পারছি না, তোরা চলে যা। সাথে সাথে বাকী ভাইদের পশ্চিম দিকে অজানা গন্তব্যে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। আর আমিও আমার মাকে নিয়ে বাবু দুলাল চক্রবর্তী মহোদয়ের বাড়ির বিপরীতে (বর্তমানে বুড়ি) পুকুর পাড়ে বেত ঝাড়ের খোঁপে লুকিয়ে রইলাম। ঐ খোঁপটার ভিতরে গিয়ে দেখি, আমাদের মত আরও (১০-১২) জন ভীত সন্ত্রস্ত মন নিয়ে কাতরাচ্ছেন ঐ যেন পাক বাহিনী আসছে। কিন্তু আমাদের দেখে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং আমাদের জায়গা করে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখি মুজাফরাবাদে একজন দাঁড়িওয়ালা লোক (রাজাকার) আট দশজন পাক হানাদার বাহিনীর অস্ত্র সজ্জিত লোককে নিয়ে আসল। আমি তখন আমার মায়ের কোলে, পাশে বাবা মৃত্যুর প্রহর গুনছে। হানাদার কুত্তারা এক নজর দেখে, ওদের ভাষায় সব পুরুষ লোকদের লাইনে দাঁড়াতে বললেন। ওদের ঐ কথাগুলো সবাই বুঝতে না পারলেও রাজাকার এর বাচ্চারা দোভাষীর কাজ করে, বাবাদের লাইনে দাঁড় করালেন। সবার মত আমার বাবাও মাকে শেষ বিদায় জানিয়ে লাইনে দাঁড়ালেন। আমরা লাইনের কিছুটা দূরে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। মা জানত না যে, এ দেখাই ছিল বাবাকে শেষ দেখা। পর মুহূর্তেই বেশ কয়েকটা গুলির শব্দ। ঐ হিংস্র পশুরা সব পুরুষদের গুলি করে হত্যা করল। পড়ে রইল আমার বাবা ও অন্যান্যদের মৃতদেহ। এর পরে সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এল যার যার আত্মীয় স্বজন ধরাধরি করে মৃতদেহকে স্ব ভূমিতে নিয়ে গেল, আমাদেরও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। পাড়া প্রতিবেশিরা এসে বাবার মৃতদেহকে বাড়িতে নিয়ে এল। বাড়িতে এসে দেখি রাজাকারেরা সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। আর বাকী সব আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় বাবাকে সৎকার করার মত পরিবেশ ছিল না। আমাদেরই দক্ষিণ পুকুর পাড়ে বাবার তৈরী একটা সুড়ঙ্গ ছিল। এটা ছিল আমার বোনদের নিরাপদ আশ্রয়। শেষ পর্যন্ত সেই সুড়ঙ্গে বাবাকে সমাহিত করা হল। এরপর যার কথা না বললে আমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবো এবং বাবার আত্মাও অতৃপ্ত থেকে

যাবে, তিনি হচ্ছেন আমাদের গ্রামের একজন শিক্ষানুরাগী বর্তমানে একটি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বাবু যতীন্দ্র লাল নন্দী মহোদয়। সেই কাকুর বাসভবনে আমাকে আর আমার মাকে একমাস যাবৎ আশ্রয় দিলেন এবং বাবার পরলৌকিক কাজ কর্মাদি উনার সহায়তায় সম্পন্ন করালেন। তাই আমরা চিরকাল উনাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ রাখব। ইতিমধ্যে আমার বড় ভাইয়েরা ভারত থেকে ফিরে আসল। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলাম। তাই আমার গর্ভধারিনী গর্বিত মা, অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করে সবাইকে শিক্ষিত করে প্রত্যেককে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাবার জন্য তৈরী করে দিয়েছেন। সে কারণে প্রয়াত গর্বিত মাকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং সাথে সাথে শত দুঃখ বেদনা থাকা সত্ত্বেও পিতৃহারা সন্তান হিসাবে গর্ববোধ করছি, দেশের জন্য আমার বাবা আত্মাহুতি দিয়েছেন। পরিশেষে আবারও আমার বাবার মত যাঁরা ঐ দিনে অত্র গ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

স্বপন কান্তি দত্ত, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

সেদিন ঠিক সকাল ৮ টায় পাক বাহিনী চারদিক থেকে গ্রামে আক্রমণ চালায়। গ্রামের লোকজন পাশের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমি, আমার বড় দাদা অ্যাডভোকেট সুজিত বিকাশ দত্ত, আমার ছোট ভাই তপন দত্ত এবং বাবা তখন ঘরের ভিতর সকাল বেলার খবর শুনছিলাম। মেজ দাদা নিরোধ দত্ত ছাদের উপর ঘুমিয়েছিলেন কারণ রাতে পাহারা দিয়েছিল। হঠাৎ শুনলাম পাক বাহিনী এসেছে। বাবা আমাদেরকে পালাতে বললেন। আমরা পাশের গ্রাম রশিদাবাদের দিকে ছুটলাম। আমাদের চলার পথে গোলাবারুদের শব্দে পুরো গ্রাম প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। আমার মেজ দাদা নিরুপায় হয়ে তেতুঁল গাছে উঠে প্রাণরক্ষা করেছিল। সবখানে লাশ আর লাশ। তাদের অনেকের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের মৃত্যু কাহিনী তুলে ধরলাম। বিকাল ৪.০০ টার দিকে যখন পাকিস্তানী বাহিনী এবং তাদের দোসররা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে গেছে আমরা গ্রামের দক্ষিণ দিক হতে তখন গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করলাম, দেখতে পাই আমাদের বড় পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে ঝোপের মধ্যে যারা লুকিয়েছিল প্রথমে দেখতে পাই বীরেন্দ্র দত্ত (সাগরের বাবা) মৃত অবস্থায় শুয়ে আছে তাকে মাটিতে ফেলে মুখে গুলি করেছে, সুধাংশু দত্ত, সারদা সেন (নিতু সেনের বাবা), কামিনী দত্ত (আশুতোষ দত্তের কাকা)। পুত্রহারা, ভ্রাতৃহারা, পিতৃহারা, মাতৃহারা গ্রামবাসীর আর্তনাদে গ্রামের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠছিল। তারপর শুনতে পাই আমার পশ্চিম বাড়ির অর্থাৎ পুকুরের পশ্চিম পাড়ে নিরঞ্জন বিশ্বাস ও রুহিনী দত্তের কথা, এছাড়া আরো অনেকের মৃত্যু কাহিনী। রুহিনী দত্ত ভাল পালা কীর্ত্তন করতেন। আরো বলতে হয় মাস্টার রাইমোহন বিশ্বাস, রাজ বিহারী বিশ্বাস, নিখিল চৌধুরী, অনিল চৌধুরী, দুলাল চৌধুরী, সুনিল চৌধুরী, শংকর সেন, রজনী সেন প্রমুখের নাম। আমার মেজদাদা নিরোধ দত্ত, সে ছিল খুব সাহসী ও সামাজিক। রাত হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে বীরেন্দ্র দত্ত, সারদা সেন, সুধাংশু দত্ত, কামিনী দত্ত এই চারজনকে মেজ দাদা বলল ওদের সৎকার কিছু করতে না পারলেও অন্তত একটি গর্ত করে মুখে আগুন দিয়ে গর্তে মাটি দিয়ে যাই, তিনি তাই করলেন। তার পরের দিন রাতেই আমার সেজ দাদা ইঞ্জিনিয়ার অরুণ দত্তের উৎসাহ ও দৃঢ় প্রত্যয়ে আমরা ১৩ জন এক সাথে গ্রাম ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে চলে যাই। শরণার্থী হয়ে ২/৩ মাস কাটিয়ে ছিলাম ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে। তারপর আবার ভারতীয় আত্মীয়দের তত্ত্বাবধানে টুকি-টাকি কিছু করে জীবিকা নির্বাহ করতাম, আর বাকি মাসগুলো নিঃস্ব হয়ে কোথাও গেলে আত্মীয়স্বজনের সঠিক মর্যাদা আশা করা যায় না। তা হওয়াটা স্বাভাবিক। যাহোক এভাবে অনেক বেদনা ভরা ঘটনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল ৯ মাস। যখন ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস ঘোষিত হলো তখন স্বদেশ ফেরার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ডিসেম্বরের শেষের দিকে দেশে ফিরে দেখি সুদীর্ঘ পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার দৃশ্যমান, গাছ বলতে একটাও ছিল না। গাছগুলো কেটে নেওয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে অর্থাৎ আমাদের গ্রামটা ছিল তাদের জন্য কাটার পাহাড়। আমাদের ভিটে ছিল বেগুনক্ষেত। তাই স্ব স্ব ভিটে বাড়ি সনাক্ত করা কষ্ট হয়ে উঠেছিল। যাইহোক পোড়া ভিটের উপর গ্রামখানি আবার লোকালয়ে পরিণত হয়েছে এবং এর বুকে অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এ্যাডভোকেট, শিক্ষক ও সর্বোচ্চ ডিগ্রীদারী হয়ে দেশের বড় বড় আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রামের গৌরব বর্ধিত করেছে। এছাড়া বর্তমানে গ্রামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দেখেই গর্বে বুকটা ভরে উঠে।

বাবুল বিশ্বাস, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

৩ মে রক্ত ঝরা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগের দিন। ২ মে সারা রাত পাহারা শেষে গ্রামবাসীরা দৈনন্দিন কাজ কর্মে রত, কেউ ঘুমাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ৩ মে ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আরম্ভ হল পশ্চিমা হানাদার বাহিনীর ভারী অস্ত্রের আক্রমণ। আক্রমণটা হয়েছিল গ্রামের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে, উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক থেকে গ্রামে প্রবেশ করার যে তিনটি সড়ক পশ্চিম দিকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে আরাকান সড়কের সাথে মিশেছে, সেই পথ দিয়ে। গ্রামটি চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক বা আরাকান সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণ তিন কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে সাড়ে তিন কিলোমিটার বিস্তৃত। গ্রামটির উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে তিনটি সড়ক আরাকান সড়ক থেকে গ্রামে ঢুকেছে। ঐ সড়ক গুলোর মুখে ভারী অস্ত্র বসিয়ে হানাদার বাহিনী এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল। বাকি সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আরম্ভ হল গণহত্যা।

অন্যদিকে পাকিস্তানের মদদ পুষ্ট বাঙ্গালি লুটেরারা দলে দলে গ্রামে ঢুকতে লাগল। লুটেরারা ধান-চাল, গরু-ছাগল, ঢেউ টিন, স্বর্ণালংকার, বাসন-পত্র, আসবাবপত্র, ইত্যাদি সব মালামাল লুট করে নিতে ব্যস্ত। সেইদিন এইভাবেই চলতে থাকল হত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতনের পালা। আরও মর্মান্তিক ঘটনা হল এই যে, কোন যুবতী নারী লুকিয়ে থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল বটে শেষ পর্যন্ত রাজাকারদের হাত থেকে তাঁরা কিন্তু রেহাই পায়নি। তাঁরা সে দিন হারিয়েছিল সম্ভ্রম। সেই দিন এই গ্রামের কোন কোন যুবতী ও কুল বধূরা বেশী দূর দৌড়ে পালিয়ে যেতে না পারাতে পশ্চিমা হানাদার বাহিনীর হাতে তাদের সম্ভ্রম হারাতে বাধ্য হয়েছিল।

ঐ দিন ঠিক এইভাবেই ধ্বংসযজ্ঞ চলেছিল বেলা চারটা পর্যন্ত। পাঞ্জাবী ও বেলুচী হানাদার বাহিনী গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াতে দুই এক জন করে পুরুষেরা গ্রামে ঢুকতে চাইলে, লুটেরারা পাঞ্জাবী আসছে-আসছে বলে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় লুটেরারা লুট ও নারী নির্যাতন চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে বহু গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় নেয়। তবে অধিকাংশ গ্রামবাসী গ্রামের পশ্চিম অংশে খোলা জায়গায় বা মুষ্টিমেয় অবশিষ্ট চালাঘর ও তার আঙ্গিনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সারা দিনের ছুটো ছুটি, অনাহারে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সকলের শরীর মন দুটোই ভেঙ্গে গেছে। তার উপর না আছে মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁই। আবারও পালাতে হওয়ার ভয়, সর্বোপরি স্বজন হারানোর আহাজারী ও করুণ আর্তনাদের কথা স্মরণ করলে, আমরা যে উন্নত বিশ্বের সভ্য জাতি, তা মানতে খুবই কষ্ট হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধের স্ব-পক্ষের দুই একজন হৃদয়বান লোক পাশের গ্রাম থেকে খাদ্য সামগ্রী এনে দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। তাও আজ কিন্তু স্মরণীয় বিষয়। গ্রামের সম্পূর্ণ অংশই পোড়া মাটির ভিটা। ঘর বাড়ির অবশিষ্ট বলতে কিছুই নেই বললেই চলে। কেউ অনাহারে কেউ অর্ধাহারে, শোকে কান্নায় ও দুঃখের মধ্যেই গত হল সেই কালো রাত্রি। পর দিন থেকে চলতে থাকলো দফায় দফায় লুণ্ঠন। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই, দলে দলে লুটেরারা গ্রামে ঢুকতে লাগলো। কেউ পুকুরের মাছ, কেউ মাঠের ধান, কেউ মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা দ্রব্যাদি দখল ও টিন, গাছ, গরু ছাগল ইত্যাদি অবশিষ্ট মালামাল লুট করে নিতে লাগল। মাঠে ধান শুদ্ধ জমি দখল করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল লুটেরাদের মধ্যে। গ্রামের পশ্চিমাংশে বসবাসরত গ্রামবাসীর ছিল না সে দিন প্রতিবাদের ক্ষমতা। তখন সকলের অসহায় ভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

পরবর্তী পর্যায়ে পাশের গ্রামের বহু রাজাকার, আলবদর বাহিনী আমার জানা মতে স্বর্গীয় বাবু যাত্রা মোহন চৌধুরী মহোদয়কে এই রাজাকার বাহিনীই গুলি করে হত্যা করেছে।

[লেখাটি *উত্তাল*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা, ২০১০ থেকে সংকলিত]

গৌরি শংকর চৌধুরী (৬০), পিতা- ডা. শ্যামাচরণ চৌধুরী, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

বয়সে তখন আমি ছোট, সব ঘটনা মনে নেই, তবু মনে পড়ে ৩ মে এর কয়েকদিন আগে গ্রামের উত্তর প্রান্তে একমাত্র তমালতলা আশ্রমটি জ্বালিয়ে দেয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাকিস্তানীদের দোসররা। যদিও যুব সমাজ অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিয়ে রেখেছিলো গ্রামটা। প্রায় দিনই পাঞ্জাবী আসছে বলে গুজব হতো এবং সারারাত্রি পাহারা দিয়ে ভোরে ঘুমাতে যাওয়ার জন্য আয়োজন করছে। মহিলারা গৃহস্থালির কাজ কর্মে ব্যস্ত কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে কেউবা বাড়ি ঢুকে ঘুমাতে যাবে। এমন সময় মুজাফরাবাদ গ্রামের ভাগ্যাকাশে এক দুর্যোগের ঘন ঘটা দেখা দিল। দিনটি ছিল গ্রামের চরম দুঃখের দিন এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

সেদিন ভোরে গ্রামের প্রবেশ পথের ৩ দিকে ৩টি ভারী মেশিন গান দিয়ে পাঞ্জাবীরা অবস্থান গ্রহণ করে। আমাদের বাড়িটা অবস্থানকৃত পাঞ্জাবীদের থেকে কয়েকশত হাত দূরে অবস্থিত। বাড়ি থেকে পাঞ্জাবীদের অবস্থান দেখতে পেয়ে স্রষ্টার কৃপায় গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে দৌড়ে পালিয়ে যায়। চলার পথে অনেক মেশিনগানের গুলি এলোপাতাড়ি ভাবে আমার চারপাশে আসতে দেখতে পাই। পরবর্তীতে ঐখানে নিরাপদ মনে না হওয়ায় মুসলিম বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিই। আশ্রয়কৃত মুসলিম পরিবারটি আমাকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তাদের এ উদার ও মনুষ্যত্বের দয়া আজীবন আমার স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ঐ সময় পরম করুণাময়ের কাছে বার বার প্রার্থনা করছিলাম পরিবারের ও বাড়ির সবাইকে যেন অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাই। ভাবার পরিধি পরিবার ও বাড়ি পর্যন্ত কারণ বৃহত্তর পরিসরে ভাববার সময় হয়নি তখনো। বিকেল ৫.০০ ঘটিকার সময় ততক্ষণে পাঞ্জাবীরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে চলে গেছে। মাতৃহারা, পিতৃহারা, ভ্রাতৃহারা গ্রামবাসীরা আর্তনাদের গ্রামের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠছিলো। জানা গেল বলি হয়েছে অনেক মা বোনের সম্ভ্রম। বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম প্রায় সব ঘরেই আগুন জ্বলছিল।

উঁকি দিয়ে দেখি ঘরের ভেতরে কিছু নেই। সেগুলো আগে লুট করেই ঘরে আগুন জ্বালানো হয়েছে। বাড়ির এক পাশে গুলিবিদ্ধ আমার বড়দা স্বর্গীয় ডাঃ নিরঞ্জন চৌধুরী মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। স্বজন হারানো সেই মর্মান্তিক দৃশ্য হৃদয় তন্ত্রীতে আজো বড় বাজে। ৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ঘোষিত হলো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সে বিজয়োল্লাসে বাংলাদেশের সাথে ভারতবর্ষও মেতে উঠল। ৭১ এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে দেশে ফিরে দেখি গ্রামের পূর্ব প্রান্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পরিস্কার দৃশ্যমান। ইতোমধ্যে গ্রামের বড় বড় গাছ যা ছিল সব কেটে নেওয়া হল পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে। আমাদের ভিটিতে ছিলো বেগুন ক্ষেত। তাই স্ব স্ব ভিটিবাড়ি ও সনাক্ত করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সে যাই হোক পোড়া ভিটির উপর সে গ্রামখানি আবার লোকালয়ে পরিণত হয়েছে এবং এরই বুকে অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী হয়ে দেশের বড় বড় আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রামের গৌরব বর্ধিত করেছে তা দেখেই গর্বে বুকটা ভরে ওঠে।

[লেখাটি *উত্তাল*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা, ২০১০ থেকে সংকলিত]

আরদেন্দু বিকাশ নন্দী (৬০), পিতা- সারদা চরণ নন্দী, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম

২ মে ১৯৭১, প্রতিদিনের মতে মুজাফরাবাদ আদর্শ ও স্বনির্ভর গ্রামের আতঙ্কের মধ্যে রাত্রে পাহারা শুরু হয়। ৩ মে দিবাগত রাত ভোর ৫টা ২০মি. গ্রামে তিনটি প্রবেশ পথে পাক হানাদার বাহিনী , মেশিনগান, রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গ্রামে ঢুকে গণহত্যা, রাহাজানি, অগ্নিসংযোগ ও ব্যভিচার শুরু করে। ঠিক তখনি নারী-পুরুষের ছুটোছুটি, হাহাকার, আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। চতুর্দিকে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল। পাক হানাদার বাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র নারী পুরুষকে নির্বিচারে গুলি করা শুরু করে। নিরূপায় হয়ে যারা পালিয়ে জীবিত ছিলাম তারা পরদিন সকালে এসে দেখতে পেলাম, গ্রামের রাস্তা, ঝোপ-ঝাড়ে অগণিত লাশ পড়ে আছে। আমি, বাবুল কান্তি দত্ত (অসহযোগ আন্দোলনে ছুরিকাহত), রঞ্জিত কুমার চৌধুরী, সুনিল কান্তি বিশ্বাস, নারায়ণ কর, অরবিন্দু সেন গ্রামের আরো অনেক যুবক লাশ একত্রিত করে বর্তমান বধ্যভূমিতে (মধ্যম মুজাফরাবাদ) ৬/৭ টা গর্তে বেশ কিছু লাশ সমাহিত করি। পরবর্তীতে আমরা উলিখিত পাঁচ বন্ধু ভারতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করি। তিনদিন হাঁটার পর রামগড় হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। সাব্রুম থেকে হরিণা হয়ে আম্পি নগরে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শেষে (৩৩দিন) আবার হরিণা ক্যাম্পে ফিরে আসি। এরপর ছাগলনাইয়াতে এসে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে টানা ১৩ দিন অতিবাহিত করি। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের বিশেষ গ্রুপ হিসেবে (চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম উত্তর) বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করি।

[লেখাটি *উত্তাল*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা, ২০১০ থেকে সংকলিত]

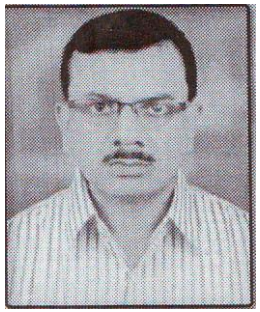

অজয় কুমার বিশ্বাস (বাপী), পিতা- শহীদ রাইমোহন বিশ্বাস, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। পরিচয়- ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, লোহাগাড়া শাখা, চট্টগ্রাম

৩ মে ১৯৭১ সাল। ইতিহাসের সাক্ষী এই একটি দিনে মুজাফরাবাদ গ্রামে কি রকম নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলেছিল তা মনে হলে আজও গ্রামের মানুষ শিউরে ওঠে। ঐদিন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকারদের অত্যাচারে পুরো গ্রাম পরিণত হয়েছিল একটি মহাশ্মশানে। গ্রামের মানুষ যখন ভোর রাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন, তখন হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনী পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলেছিল। তারপর শুরু হল নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। প্রায় ৩০০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামের সকল বাড়িঘর আগুনের লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে ছাইয়ে পরিণত হল। মুহূর্তেই সুন্দর আদর্শ গ্রামটি পরিণত হয়ে গেল মহাশ্মশানে।

যেদিকে দেখা যায় সেদিকে মৃতদেহ। গ্রামের বাতাসে পোড়া মাটির গন্ধ, পোড়া মানুষের গন্ধ। সেদিনের দুঃসহ স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বল জ্বল করছে। হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন আমার পিতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাষ্টারদা শহীদ রাইমোহন বিশ্বাস। তাঁকে গুলি করেও ক্ষান্ত হয়নি হানাদার বাহিনী। তাঁর পুরো দেহটাকে রাইফেলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেছে। আমাদের বাড়ির আগুনে আমার ঠাকুরদাদা রাস বিহারী বিশ্বাসকে (বাবার কাকা) হাত পা বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলেছিল। জীবন্ত মানুষটা কয়েক মিনিটের মধ্যে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। এদৃশ্য এখনও ভোলার নয়। বাবা এবং দাদার মৃতদেহ কোন রকমে বাবার বন্ধু নুর আহমদ সাহেব এবং তাঁর সহোদয় ভাইদের সহায়তায় মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। কত মৃতদেহ শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েছে তার হিসাব নেই। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হলো। প্রতিবছর গ্রামে ৩ মে স্মরণে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু শহীদ পরিবারের সদস্যদের খবর কেউ রাখে না। নতুন প্রজন্মের কাছে আহ্বান যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তারা যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে শহীদের স্মৃতি যেন অতল গভীরে হারিয়ে না যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলে, যাতে শহীদের আত্মা শান্তি পায়। শহীদ পরিবার তা দেখে গর্ব করে বলতে পারে আমরা শহীদ পরিবারের গর্বিত সদস্য।

[লেখাটি *কালিকা* মুজাফরাবাদ সার্বজনীন কালী মন্দিরের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন স্মরণিকা, ২০১৪ থেকে সংকলিত]

একজন নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকার

(সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ইচ্ছায় তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ১২ নভেম্বর ২০১৪)

আমার বয়স তখন ১৬। তখনো আমার বিয়ে হয়নি। দেখতে একটু সুন্দর থাকার ফলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাবা আমাকে রাজাকারদের ভয়ে ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না। তাই মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে অনেকটা অবরুদ্ধ জীবন শুরু হয়। কিন্তু এরপর ও আমি নিজেকে বাঁচাতে পারিনি। ৩ মে পাক হানাদাররা যখন গ্রাম আক্রমণ করল আমি তখনো ঘুম থেকে উঠিনি। বাবার চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গে। আমি তাড়াতাড়ি করে খাটের তলায় ঢুকে যাই। প্রায় ঘন্টাখানেক আমি এখানেই ছিলাম। এরপর পাকবাহিনী আমাদের ঘর আক্রমণ করে। আমাকে খাটের নিচ থেকে বের করে, তিনজন পাক সেনা পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করে। আমি প্রায় মৃতের মত পড়ে থাকি।

সন্ধ্যার পর যখন আমার পরিবারের লোকজন ফিরে আসে তখন তারা আমাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পাকবাহিনীর পাশাপাশি রাজাকাররাও আমাকে নির্যাতন করেছে। যাদের দুই জন আমার পূর্ব পরিচিত ছিল। পাশবিক নির্যাতনের ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পরি, কিছুদিন গ্রামে ছিলাম। পরবর্তীতে রাজাকারদের ভয়ে আমি প্রায় সময় গায়ে কালি মেখে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতাম। রাজাকারদের অত্যাচার বেড়ে গেলে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাই। এরপর বেশ কয়েক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। শেষে ভারতের শিলচরে পালিয়ে যায়।

(চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তাঁর উপর নির্যাতনের অনেক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। অমানবিক, বর্বর এই পৈশাচিকতার বর্ণনা তুলে ধরা সম্ভব হল না।)

স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস

৩ মে মুজাফরাবাদ গণহত্যার স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৭২ সালে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়, ‘শহীদ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়’। সেই মর্মান্তিক স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে প্রতি বছর ঐ দিনে মুজাফরাবাদে গণহত্যা দিবস পালন করা হয়। শহীদদের আত্মার শান্তির জন্যে স্থানীয় বিবেকানন্দ সংঘের পক্ষ থেকে প্রতি বছর পালন করা হতো শ্রদ্ধানুষ্ঠান, শহীদের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনারে অর্পণ করা হতো পুষ্পার্ঘ, অনুষ্ঠিত হতো স্মরণসভা।

২৭

শেখ মুজিবুর রহমান

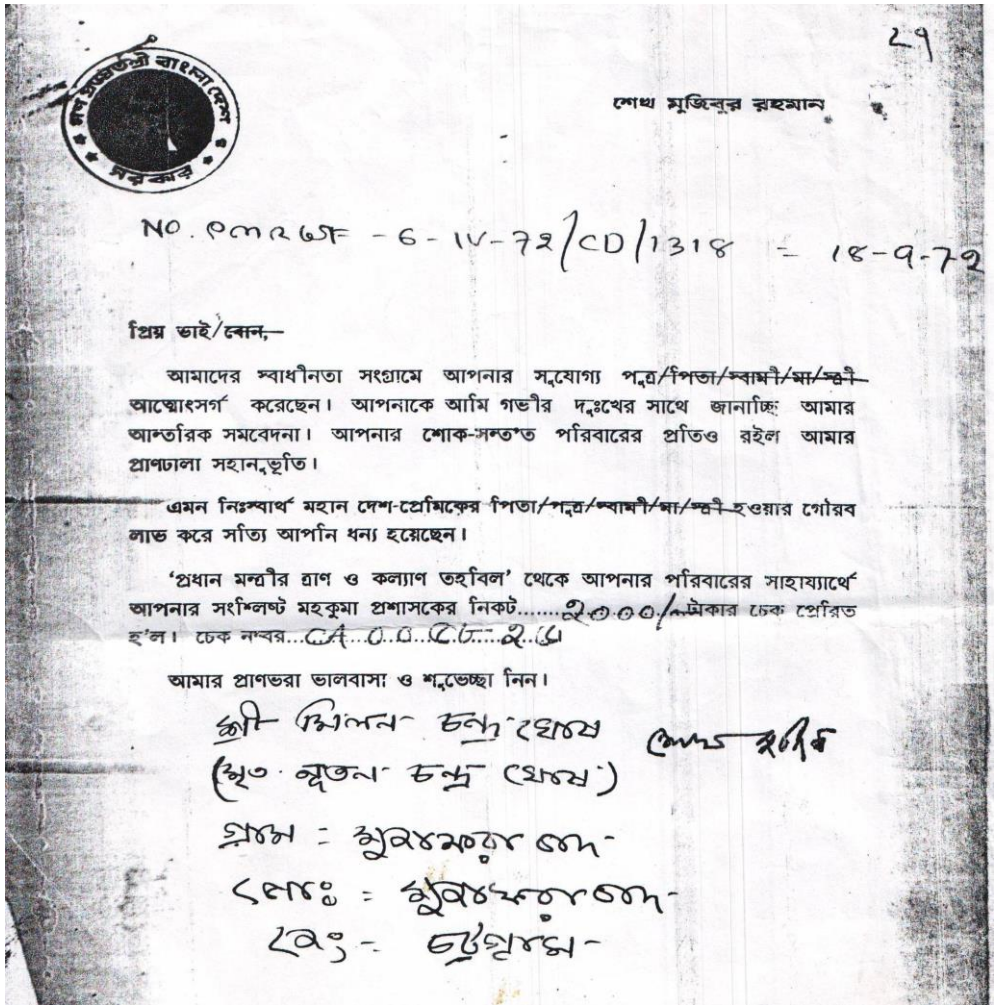

NO. প্রমকত্রা - 6 - IV - 72/CD/1318 = 18-9-72

প্রিয় ভাই/~~বোন,~~

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার সুযোগ্য পুত্র/~~পিতা/স্বামী/মা/স্ত্রী~~ আত্মোৎসর্গ করেছেন। আপনাকে আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আপনার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও রইল আমার প্রাণঢালা সহানুভূতি।

এমন নিঃস্বার্থ মহান দেশ-প্রেমিকের পিতা/~~পুত্র/স্বামী/মা/স্ত্রী~~ হওয়ার গৌরব লাভ করে সত্যি আপনি ধন্য হয়েছেন।

‘প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল’ থেকে আপনার পরিবারের সাহায্যার্থে আপনার সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসকের নিকট.......2000/- টাকার চেক প্রেরিত হ’ল। চেক নম্বর...CA...0...0...CC...2...6

আমার প্রাণভরা ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিন।

শ্রী মিলন চন্দ্র ঘোষ
(মৃত নূতন চন্দ্র ঘোষ)
গ্রাম = মুজাফফরাবাদ
পোঃ = মুজাফফরাবাদ
জেঃ - চট্টগ্রাম

শেখ মুজিব

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত শহীদদের ২০০০/- টাকার চেকের চিঠি

কিন্তু মুজাফরাবাদের শহীদ পরিবারগুলো সরকারের পক্ষ থেকে পাননি কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য-সহযোগিতা। ১৯৭২ সালে গুটি কয়েক শহীদ পরিবারকে বঙ্গবন্ধু সরকার ২০০০

টাকা করে প্রদান করেন। কয়েকটি পরিবারকে নতুন করে ঘর তুলে দেয়া হয়।

অনেক ধর্ষিত, লাঞ্ছিত নারী এই সময় লজ্জায় গ্রাম ছেড়ে চলে যান। অনেকেই বেঁচে নিয়েছে আত্মহননের পথ। বিশেষ করে বেশ কয়েকজন অষ্টাদশী তরুণী পরিবার পরিজনসহ ভারতে চলে যান। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় সেইরকম তিনজন বীরাঙ্গনা নারীর বর্ণনা উঠে এসেছে। যাদের দু'জন লোকলজ্জার ভয়ে পরবর্তীতে ভারতে চলে যান।

পরবর্তীতে প্রায় ৩ দশক পর এই স্কুলের পাশেই নির্মিত হয় শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ। এই সুদৃশ্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য শামসুল ইসলাম ও সংরক্ষিত নারী সদস্য বেগম চেমন আরা তৈয়ব। বর্তমানে স্থানীয় প্রশাসন সরকারিভাবে দিনটিকে পালন করেন। শহীদদের স্মরণে এই দিন গ্রামের লোকজন উপবাসব্রত পালন করে। গ্রামের সকল বাড়ির উনুন জ্বালানো এই দিন বন্ধ থাকে । গভীর শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় স্মরণ করা হয় বীর শহীদদের।

তবে বধ্যভূমিটি অরক্ষিত পড়ে আছে। একপাশে কাটাঁতারের সামান্য ঘেরাও দিয়ে একে সংরক্ষণ করা হয়েছে। রয়েছে গাছের মধ্যে টিনের তৈরী একটি ছোট নাম ফলক 'মুজাফরাবাদ বধ্যভূমি'। ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করা হলেও এটাকে সংরক্ষণের কোন উদ্যেগ নেয়া হয়নি।

এই বধ্যভূমিতে তিনশর বেশি শহীদের নাম ও পরিচয় যুক্ত একটি নামফলক স্থাপন, বধ্যভূমির চারপাশে নিরাপত্তার বেষ্টনী স্থাপন ও মূল সড়কের সাথে সংযোগ সড়ক সংস্কার এলাকাবাসীর দাবী। শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার নির্মাণ করে বধ্যভূমিটাকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

মূল্যায়ন

মুজাফরাবাদ গণহত্যা মুক্তিযুদ্ধের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। এই গণহত্যার প্রকৃতি নির্ধারিত করলে দেখা যায়, এটি মূলত পরিকল্পিত গণহত্যা। খরনা ইউনিয়নের স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতাদের নীল নকশায় এটি ঘটেছে। গণহত্যার মূল মোটিভ ছিল হিন্দু নিধন এবং পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নারীদের নির্যাতন। তাদের ঘর বাড়ি লুটপাট করা, জায়গা সম্পত্তি দখল করে নেয়া। এখানে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলে স্থানীয় রাজাকার বাহিনী পাকবাহিনীকে মুজাফরাবাদ আক্রমণে ইন্ধন দেয়। ৩ মে পাকবাহিনীর ৮ ঘন্টার আক্রমণে ৩০০ গ্রামবাসী প্রাণ হারান। পাকবাহিনীর সাথে বর্বর এই হত্যাযজ্ঞে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা রমিজ মিয়া ও নুরু বক্সের বাহিনী। তারাও সমান তালে চালিয়েছে নির্যাতন ও লুটপাট।

গণহত্যা এবং পরবর্তীতে স্থানীয় রাজাকার আলবদরদের নিয়মিত আক্রমণ মুজাফরাবাদ গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। গ্রামের বেঁচে থাকা অবশিষ্ট লোকজন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ত্রিপুরা চলে যান। কেউবা যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের পর শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় লাভকারী গ্রামবাসী, রণাঙ্গনে অংশ নেয়া মুক্তিযোদ্ধারা আবার ফিরে আসে মুজাফরাবাদে। স্বজনহারানো শোকার্ত পরিবারগুলো আবার ঘুরে দাঁড়ায়। নতুন স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয় পথচলা। আর নতুন এই পথচলায় তাদের প্রেরণা হয়েছিল ৩ মে ১৯৭১। স্থানীয় তরুণরা এই স্মৃতিকে ধারণ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করে *সমন্বয় ক্লাব*। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি প্রতিবছর ৩ মে মুজাফরাবাদ গণহত্যা দিবস পালন করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. নাসিরুদ্দিন চৌধুরী (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমাণ্ড, চট্টগ্রাম, ২০১৩

২. সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম, ঢাকা, ২০১০

৩. গাজী সালেহ উদ্দিন, *প্রামাণ্য দলিল মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বলাকা, চট্টগ্রাম, ২০১৩

৪. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২৫ মার্চ ২০১৩

৫. মাহফুজুর রহমান, ডা., *বাঙ্গালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধাদের গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩

৬. *উত্তাল*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা, ২০১০

৭. *স্মৃতি*, মুজাফরাবাদ সমন্বয় ক্লাব পত্রিকা, ২০০২

৮. *সাকোঁ*, মুজাফরাবাদ এন, জে উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুর্নমিলনী স্মরণিকা, ২০১০

৯. তপন কুমার দে, *গণহত্যা ৭১*, নওরোজ, ঢাকা, ২০০১

১০. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, *একাত্তরের বিজয় গাথাঁ*, ভূমিকা, চট্টগ্রাম, ২০১৪

১১. *পদক্ষেপ*, মুজাফরাবাদ সমাজকল্যাণ সংস্থা পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ২০১০

১২. *কালিকা*, মুজাফরাবাদ সার্বজনীন কালী মন্দিরের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন স্মরণিকা, ২০১৪

সাক্ষাৎকার

১. সন্তোষ কুমার নন্দী (৫৯), পেশা- চাকুরি, পিতা- প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র নন্দী, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম কার্যালয়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

২. হরিমোহন কর (৮৪), পেশা- চাকুরি(অব.), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ১২ নভেম্বর ২০১৪

৩. সুনীল সেন (৭৫), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ১২ নভেম্বর ২০১৪। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন: তপন পালিত, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

৪. হারাধন ঘোষ রায় (৬৩), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৫. গৌরাঙ্গ পদ ঘোষ (৭২), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৬. দুলাল কুমার সরকার (৭২), গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, চট্টগ্রাম, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৭. একজন নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকার, (সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ইচ্ছায় তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুজাফরাবাদ, পটিয়া, ১২ নভেম্বর ২০১৪

৮. সুমন সেন (৫১), পিতা- শহীদ শংকর প্রসাদ সেন, গ্রাম- মুজাফরাবাদ, ইউনিয়ন- খরনা, উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নের ***মুজাফরাবাদ গণহত্যা*** নিয়ে গ্রন্থমালার বর্তমান গ্রন্থটি রচিত। একাত্তরের ৩ মে কারা, কীভাবে সেই ঘৃণ্যতম গণহত্যা সংঘটিত করেছিল নির্যাতিত, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য থেকে তা জানা যাবে; জানা যাবে শহীদদের নাম-পরিচয়, বীরাঙ্গনা ও নির্যাতিতদের পরিচয় এবং বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস ও বর্তমান অবস্থা। এ যেন মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্যের কয়েকটি রক্তভেজা পাতা, শহীদের আত্মদানের অশ্রুমাখা গাথা– সর্বোপরি মুক্তিসংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনী। গ্রন্থটি রচনা করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক চৌধুরী শহীদ কাদের। এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ।